কিশোর সাহিত্য সমগ্র
অন্নদাশঙ্কর রায়

কিশোর সাহিত্য সমগ্র

অন্নদাশঙ্কর রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

সূচীপত্র

পাহাড়ী (বড়গল্প)	৩
আইল অফ্ ওয়াইট (ভ্রমণ কাহিনী)	২৫
ছেলেমেয়েদের থিয়েটার ,,	৩১
জার্মেনী রাইনল্যাণ্ড ,,	৩৭
সুইটজারল্যাণ্ড ,,	৪৩
যোগীন্দ্রনাথ সরকার (রম্যরচনা)	৪৮
সুকুমার রায় ,,	৪৯
ছড়ার ভূমিকা	৫০
ছড়া— লণ্ডন ফগ্/মুখে মুখে জবাব/ কাঁদুনি/হাভাতে/ভেল্‌কি/বাতাসিয়া লুপ/পার্সেল/ যেখানে বাঘের ভয়/কলম কিনি কেন ?/ নাম করতে নেই/ফলার/ভাগ্য/হবুচন্দ্র রাজার হিংসুটে/আহা কি রান্না/ইঁদুরছানার কাণ্ড/রণ-পা	৫২-৬৬
জনরব (ছড়া নাটিকা)	৬৭
ছাগ-চরিত (গল্প)	৭২
প্রথম চিঠি ,,	৭৫
ছেলেবেলা (স্মৃতিকথা)	৭৭
ছেলেবেলায় ,,	৭৯
মাস্টারমশাই ,,	৮৪
রাজাসাহেবের জয়যাত্রা,,	৮৬
ছোটদের জন্যে লেখা,,	৮৯

কিশোর সাহিত্য সমগ্র

পাহাড়ী

একদিন সকালে উঠে চঞ্চল দেখে তাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকে যে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা রাস্তা, সেই রাস্তার ধারে জায়গা করে নিয়ে দোকানপাট বসতে যাচ্ছে। কোনো দোকানে ছেলেদের খেলনা, বাঁশী, তালপাতার সেপাই, ঘোড়ার চুল দিয়ে একখানা কাঠিতে বাঁধা ব্যাঙের মতো আওয়াজ করতে থাকা মাটির সরা, কোনো দোকানে তেল ঘি নারকেল ক্ষীর ছানা চিনির রঙিন খাবার। কোথাও ছড়ানো কাঁঠালের কোয়ায় মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে। কোথাও মনোহারী দোকান আয়না চিরুনি ছুঁচ সূতো ছুরি কাঁচের গেলাস সাবান। বেলা যতই বাড়ে লোক সমাগমও বৃদ্ধি পায়। বেশীর ভাগ পল্লীগ্রাম থেকে এসেছে। স্ত্রী, পুরুষ, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের পোষাক, গহনা ও সজ্জা থেকে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। খাটো মোটা শাড়ী ও ধুতি, মস্ত ভারি কাঁসা পিতলের খাড়ু ও মল, পুরুষদেরও কানে নোলি ও হাতে বালা, শিশুদের চোখে কাজল ও মাথায় ঝুঁটি। স্ত্রীলোকদের গায়ে মাখা হলুদবাটা ভালো করে শুকিয়ে যায় নি। চঞ্চলদের বাড়ীতেও এরা দলে দলে এসে উপস্থিত হয়। জল চেয়ে নিয়ে চিঁড়ে ধুয়ে খায়। হয়তো গতবছর এসেছিল পরিচয় দেয়। ব্যাপার কি? রথযাত্রা। দুটো রথ তৈরি হয় প্রত্যেক বছর। কাঠের রথ। একটা খুব বড়, অন্যটা ছোট। রথের উপরটা রঙীন কাপড় দিয়ে ঘিরে দেয়। ভিতরে থাকেন দেবতা, বাইরে কাঠের সারথি। ঘেরা ঘরের চারিদিকে আঙিনার মতো, সেখানটা বেড়া দেওয়া। নানা রকম কাঠের চ্যাপ্টা মূর্তি বেড়ার কাঠামোর সঙ্গে আঁটা। রথের সামনের দিকে দুটো কাঠের ঘোড়া ও নীচে বারোটা কি আটটা চাকা। শক্ত মোটা পাকানো দড়ি চারটে কি ছ'টা। পঞ্চাশ জন মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে টানতে পারে—এমন লম্বা। সে সব মানুষও গ্রাম থেকে আমদানি। তারা বেগার দিতে ধরা হয়ে এসেছে। জংলী মানুষ।

রথযাত্রার সারথির কাজ করে এক বৃদ্ধ। কাঠের সারথির কাছে দাঁড়িয়ে সে লাঠি উঁচু করে হাঁক দেয়— ''এ ভাই রে।'' জবাব আসে— ''হুঁ হুঁ।'' তখন বুড়ো চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে একটা ছড়া। খুব ভদ্র ভাষায় নয় কিন্তু। বেগারের মানুষরা পরম উৎসাহে চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো লাফ দিয়ে দৌড়ায়। তাদের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। শেষকালে রথটা ঠেকে গিয়ে কারুর দালানের গায়ে— অর্ধেকটা দেওয়াল ধ্বসিয়ে। কিংবা নিম গাছের একটা ডাল ভেঙে রথের চূড়ায় লটকে যায় ও দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটা গাছ চলৎশক্তি পেয়েছে। বন্দুকের আওয়াজ করে সেই সব উৎসাহী অশ্বকে নিবৃত্ত করতে হয়। তাদের তো বল্‌গা নেই যে টান দিলেই থামবে।

রথ 'গুণ্ডিচা ঘরে' পৌঁছবার অনেক আগেই হয় তো সন্ধ্যা হয়। সেদিনকার মতো সেইখানেই রথ থাকে। লোকের ভিড় মিলিয়ে যায়। রথের উপরকার আঙিনায়

কোনো উপায়ে বসবার অধিকার পেয়ে চঞ্চল এতক্ষণ আমোদ পাচ্ছিল, এখন নামে এবং বাড়ী গিয়ে সবাইকে বলে, রথে চড়েছিলুম। মন্দ আমোদ নয়।

রথ যখন নড়বড় করে চলে বারোটা চাকার উপর গড়গড় করতে করতে তখন কোনো গাড়ীর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। তবে চলে যত অচল হয় তার বেশী।

দোকানপাট রথের সঙ্গে সঙ্গে চলে। সকালে যে সব দোকান চঞ্চলদের বাড়ী থেকে দেখা যেতো দুপুরে তারা উঠে গিয়ে আরো উত্তরে বসেছে। যতই বেলা যায় ততই তারা চঞ্চলদের বাড়ীর নিকট থেকে দূরে যায়। চঞ্চলের তাতে ভারি আফসোস। যেন তার নিজের দোকান।

রাত্রি হলে তার মা ঠাকুরমা ও প্রতিবেশিনী মেয়েরা রথে ঠাকুর দর্শন করতে যান। চঞ্চল সঙ্গে যায়। তখন দিনের আড়ম্বর নেই, জনসমুদ্রের গর্জন ক্রমে স্তব্ধ হচ্ছে। অন্যান্য পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে মা-ঠাকুরমার আলাপ হয়। তাঁরা চঞ্চলকে দেখে নথ নাড়তে নাড়তে বলেন ''এইটি চঞ্চল ? এত বড়টি হয়েছে ?''

ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে বামুনের হাত থেকে যা ফিরে পাওয়া যায় চঞ্চল তার অংশ পায়। অন্য পাড়ার মহিলাদের কাছেও।

রামায়েৎদের মঠে হয় ঝুলন উৎসব। সেখানকার মোহান্ত সৌখীন লোক। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা ঝুলতে ঝুলতে গুটি-পো'র গান শোনেন। গুটি-পো হচ্ছে নর্তকীর বেশে সজ্জিত একটি বালক। সে হাত নেড়ে নেড়ে গান করে, হাঁটু পেতে বসে কখনো, কখনো ঘুঙুর-পরা পায়ে ঘুরপাক খায়। এক এক করে সকলের সামনে গিয়ে গানের ছলে হাত পাতে। তার পিছন পিছন ঘোরে একজন বেহালা-বাদক, একজন পাখোয়াজী। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ওস্তাদ। পাওনাটা যায় তার ট্যাঁকে। যে বয়সে অন্য ছেলেরা ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করে সে বয়সে এই সব হতভাগ্য বালক ওস্তাদের হাতে দেদার বেত খায় ও কঠিন সুর সাধে।

প্রতাপগড়ের প্রধান দেবালয় হচ্ছে বলরামের মন্দির। জগন্নাথও সেই মন্দিরে ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি জগন্নাথের জন্যে স্বতন্ত্র মন্দির সেই একই বেড়ার মধ্যে বানানো হওয়ায় তিনি পৃথক হয়েছেন। বলরামের মন্দির বহু পুরাতন। তার ভিতরকার গন্ধ ও তার বাইরের রং বেশ বনেদী। সূর্যের আলো প্রবেশের ছিদ্র পায় না। চুনকাম করাও বোধ করি নিষেধ। বলরামের মন্দিরপ্রাঙ্গণে মাঝে মাঝে ভোজ হয়। চঞ্চলরা নিমন্ত্রিত হয়। শালপাতার থালায় ঠোঙ্গায় করে নিতান্তই বলরামী ডাল ভাত ও দেশী আলুর ব্যাপার। তবু বাড়ীর বাইরে কোথাও খাবার নিমন্ত্রণ থাকলে চঞ্চলের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাড়ীর খাওয়া তো প্রতিদিন দু'বেলা আছেই।

চন্দনযাত্রা হয় 'নূতন পুকুরে'। জগন্নাথকে নড়ানো যায় না, তাঁর প্রতিনিধিরূপে মদনমোহন মূর্তি যান নৌকাবিহার করতে। ঘাটের মন্দিরে বিশ্রাম করেন। চন্দন-চর্চিত হন্। পদ্মফুলের মালা পরেন। ভারে ভারে আম খান। তারপর নৌকায় ওঠেন। জোড়া

নৌকা। চঞ্চল প্রভৃতির বসবার জায়গা থাকে। তারাও মদনমোহনের সঙ্গে পুষ্করিণী পরিক্রমা করে। সংকীর্তন কিম্বা গুটি-পো'র গান শোনে। আম খায়। চন্দন মাখে। রাত করে বাড়ী ফেরে। একুশ দিন ধরে চন্দন-যাত্রা। শেষের দিকে ধুমধাম হয়। বিস্তর বাজি পোড়ে। পুকুরের ধারে ধারে রামায়ণ মহাভারতের বিষয় নিয়ে যাত্রা অভিনয় হয়। জোড়া নৌকা মানুষের ভারে ডুবু-ডুবু করে। শোনা যায় দু'একবার নৌকাডুবি হয়েছে।

প্রতাপগড়ের দুর্গাপূজার ধরণ আলাদা। রাজবাড়ীর স্থায়ী দুর্গা প্রতিমার কাছে যা হয় তা দেখতে কেউ যায় না। কোনো জাঁকজমক নেই। কোনো বাড়ীতেই পূজার জন্যে বিশেষ প্রতিমা নির্মাণ হয় না। চঞ্চলদের বাড়ীতে হয় স্তূপীকৃত বই ও তলোয়ারের সামনে পুষ্পাঞ্জলি। দশমীর দিন রাজা যান দিগ্বিজয়ে। তাঁর সৈন্য তো নেই। আছে পুরোনো আমলের সৈন্যদের বংশধর। তারা জায়গীর ভোগ করতে করতে চাষা হয়ে গেছে। মরচে ধরা বাঁকানো তলোয়ার নিয়ে তারা হনুমানের মতো লাফায় আর হর্ষধ্বনি করে। তাদের বলে পাইক অর্থাৎ পদাতিক। তারা জাতে খণ্ডায়েৎ অর্থাৎ খণ্ডা-(খাঁড়া) ওয়ালা। সেই উল্লম্ফনকারী বীরপুরুষদের নিয়ে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে রাজা ও রাজ-সামন্তগণ রণক্ষেত্রে যাত্রা করেন। রাজা চড়েন সাজানো গাড়ীতে, বসেন ছত্রের নীচে।

গড়ের বাইরে যাঠিত্র-বাটির একটি চিরনির্দিষ্ট অংশে তীরধনুকযোগে লক্ষ্যভেদ হয়। তারপর রাজা ফেরেন তাঁর প্রাসাদে। প্রাসাদের সম্মুখে একটি খোলা জায়গায় খেলা-ধূলার আয়োজন। রাজা তখন দিব্যি ধুতি-পাঞ্জাবিপরা চাদর গায়ে দেওয়া নিরীহ ভদ্রলোক। তখন তাঁর পার্ষদ হচ্ছেন তাঁর আধুনিক আমলাবৃন্দ। চঞ্চলরা রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। গাধার দৌড়ে যে গাধাটা লাস্ট হয় সেই পায় পুরস্কার। চঞ্চলরা হো হে করে হেসে ওঠে। চর্বিলিপ্ত স্তম্ভের উপর চড়বার বারম্বার চেষ্টায় সকলে বিফল হলো। তাই দেখে একটা লোক এগিয়ে এসে দুই হাত দিয়ে প্রথমে স্তম্ভটাকে জড়িয়ে ধরল, তারপরে ডিগবাজি খেয়ে পা-দুটোকে তুলে দিল স্তম্ভের চূড়ার অভিমুখে। ভেবেছিল আর একটা ডিগবাজি খেলেই হাত দুটো ঠেকবে ঠিক চূড়ায়। কিন্তু স্তম্ভটা পিচ্ছিল। লোকটার হাত দুটো গেল সোঁ করে পিছলে। মাথাটা নারকেলের মতো মাটিতে পড়ে ফট্ করে ফাটে আর কি! মাথায় মস্ত ঝুঁটি ছিল, তাইতে বাঁচিয়ে দিল। এদিকে চঞ্চলরা হাসতে হাসতে মারা যায়।

দোলের সময় মদনমোহন গড়ের উত্তরে মাণ্ডবাসাহীর দোলমণ্ডপে গিয়ে বসেন। মেলা বসে। সে রাত্রে গোয়ালাদের উৎসব, কারণ কৃষ্ণ নাকি গোয়ালা ছিলেন। তারা খড়ম পায়ে দুটো কাটি বাজিয়ে খট খট করে মার্চ করে চলে। গায় রাখালী গান। মুখে আবীর মাখে ও মাথায় অভ্র ছড়ায়। বকাসুর থেকে থেকে ঠোঁট খুলে হাঁ করে। অঘাসুর একটা মানুষের পিঠে আর একটা মানুষ উঠলে যত উঁচু হয় তত

উঁচু। দোলমণ্ডপে গড়ের সকলে জড় হয়। সে এক রাত!

প্রতাপগড়ের পূর্বদিকের রাস্তা ধরে জঙ্গল দু ধারে রেখে অন্য একটি দেশীয় রাজ্যের ভিতর দিয়ে বিশ মাইল দূরে গেলে প্রকাণ্ড এক নদী। নদীর মাঝখানে বিস্তীর্ণ চর। সেই চরের এক পাশে নৌকা থেকে নেমে অপর পাশে নৌকায় উঠতে হয়; চরের উপর দিয়ে যেতে হয় গোরুর গাড়ীতে চড়ে। ওপারে ব্রিটিশ ভারত। ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রাদেশিক রাজধানী। রাজধানীতে চঞ্চলের মামাবাড়ী।

ডাইনে বামে জঙ্গল, দিনেদুপুরে বাঘ হানা দেয়। দলবল না জুটিয়ে কেউ রাস্তায় পা বাড়ায় না। রাত্রে যখন গোরুর গাড়ী চলে তখন একসাথে বিশখানা করে চলে। সমস্ত পথ সোরগোল করতে করতে মশাল জ্বালিয়ে যাত্রা। বাঘ না দেখলেও ''বাঘ'' ''বাঘ'' বলে চিৎকার করে হাড়ে কাঁপুনি লাগিয়ে দেয়। চোখ বুঁজে চঞ্চল ঠাকুমার ইষ্টদেবতা পৌর্ণমসী ওরফে পূর্ণমাসীর নাম জপ করে। ভাবে, বুঝি তার নিজের চোখ বন্ধ বলে বাঘেরও চোখ বন্ধ।

যেখানে ভোর হয় সেখানে একটা ঝরণা। জায়গাটার নাম দাঁড়িয়ে গেছে ''ঝরণ''। জল খাবার জন্য সেখানে সকলে গাড়ী থামায়। সেখান থেকে কিছু দূর গেলে ''খুঁটুনি''। খান দুই তিন দোকানঘর ও একটা জল-বিরল পুষ্করিণী নিয়ে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানে রান্না করে খেতে হয়। তারপর আবার সেই শাল পিয়াশাল শিমুল পলাশ কোচিলা ইত্যাদির বন ভেদ ক'রে শকটের 'কারাভান' দুর্গম পথ চক্রমুখরিত করে।

অবশেষে মহানদীর কূল। নদী না হতেই নদীর হাওয়া গায়ে এসে লাগে। খেয়াঘাটে পৌঁছে নদীর এ পার থেকে ও পারের গাছপালা আকাশের ছায়ার মত অস্পষ্ট দেখায়। সেই বিরাট নদীর উপর নৌকা ভাসাতে হবে ভাবলে রোমাঞ্চ বোধ হয়।

তবে নৌকারও বৃহৎ পাটাতন। কালো কাঠের উপর লাল নক্সা। নৌকার আকার প্রকার দেখে মনে সম্ভ্রম জাগে। যেন তাদেরও প্রাণ আছে। নৌকায় চড়ে পিছন ফিরে তাকালে একে একে অনেকগুলি পাহাড় মাথা তোলে। নিকটের পাহাড় দূরের পাহাড়। আকৃতি কোনটার রামধনুর মতো, কোনটার পিরামিডের মতো। একটি ছোট পাহাড়ের উপর রাজার বাংলো। সুদূর নদীর চরে আর একটি ঘরে উদ্যান-বেষ্টিত শিবমন্দির। সেখানকার চরটি সংকীর্ণ পার্বত্য। আর চরের আশেপাশে নদীর গভীরতা এতই বেশী যে মাঝিরা লগি দিয়ে তল পায় না। নদীর সেরূপ স্থলকে বলে ''গণ্ড''। বর্ষাকালে ওখানে প্রায়ই নৌকাডুবি হয়।

খেয়াঘাটের নৌকা চঞ্চলদের চরের এক প্রান্তে নামিয়ে দিয়ে অন্য লোক নিয়ে ফিরে যায়। চঞ্চলরা তাদের নিজেদের গোরুর গাড়ীতে চড়ে চরের উপর দিয়ে ঘুরে ফিরে অপর প্রান্তের খেয়া নৌকার খোঁজে চলে। পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয় তারা হয়ত চঞ্চলদেরই মতো পথিক। কিম্বা চরে তরমুজের ও লাল কুমড়ার আবাদ করছে, ছোট ছোট কুঁড়ে বেঁধে রাত্রে পাহারা দেবে।

সমস্তটা চর অতিক্রম করে হয়ত দেখা গেল সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। যে নৌকা গাড়ী নিতে আসে তার মাঝি ডাক শোনে না। ওপার থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। মজুর-মজুরনীরা ছোট নৌকায় করে পাড়ি দেবার সময় আশ্বাস দিয়ে গেল মাঝিকে খবর দিতে ভুলবে না। কিন্তু কোথায় মাঝি! আরে হো— ও— ও মাঝ্— ই— ই— ই। ওপার থেকে উত্তর আসে ই— ই— ই। মনে হয় ব্যাটা এইবার সাড়া দিয়েছে। আসবে ঠিক। ওপারে ঘাটের গায়ে ঢেউ ভেঙ্গে পড়ে, ছলাৎছল শব্দ শুনে অনুমান হয় জলের গায়ে লগির চোট লাগছে।

নিরাশ হয়ে চঞ্চলরা চরের উপর বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়ে। বড়রা জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে এনে মাটি খুঁড়ে চুলো বানিয়ে রান্না চাপিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে এক একবার হাঁক ছাড়ে— আরে হো.. ও... ও... ও ...ও মাঝ্— ই। শেষের কথাটা উচ্চারণ করবার আগে দম ফুরিয়ে যায়।

অবশেষে সত্যি সত্যি হয়ত মাঝি মহাপ্রভু সাড়া দেন। ততক্ষণে তাঁর নিজের উদর পূর্তি হয়েছে, এইবার মোটারকম বখশিশ আদায় করে পকেট ভর্তি—পকেট তো নেই, ট্যাঁক ভারি করবেন।

অনেক রাত্রে ওপারে উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। কিন্তু ভয়ের অবসান হয়নি। একটা বিশাল বটগাছ পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। ঐ বটগাছে এককালে ফাঁসি দেওয়া হতো। ওর অদূরে "গোরা কবর"। অর্থাৎ ইংরেজদের গোরস্থান। দেশী ও বিলাতী কত রকম ভূত ঐ গাছে ও ঐ গোরস্থানে আস্তানা করেছে কে জানে। বাঘ বড়, না ভূত বড়? যেই বড় হোক, চঞ্চলের কাছে উভয়েই ভয়ঙ্কর। চঞ্চল চোখ বুঁজে পূর্ণমাসীকে স্মরণ করে। করতে করতে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

চঞ্চলের মামাবাড়ী যদিও একই সহরে তবু সে উঠেছে তার বাবার মামাবাড়ীতে। সেখানে তার ঠাকুমার অধিকার খাটে। তাছাড়া সেখানে হবে তার বাবার মামাতো ভাইয়ের বিয়ে। বিয়েবাড়ীতে একটি ছেলের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেল। সেও ইস্কুলে পড়ে, চঞ্চলের চেয়ে বয়সে কিন্তু বড়। তার ঘুড়ি ও লাটাই আছে। সে ছাদের উপর উঠে ঘুড়ি ওড়ায়। ওস্তাদ ছেলে।

চঞ্চল তার সঙ্গে বাজার দেখতে চলল। প্রথমেই দেখল একটা সোডা লেমনেডের দোকান। লাল হলদে বেগুনে রঙের জল। দোকানদারকে পয়সা দিতেই ভস্ করে একটা আওয়াজ হলো, ফেনা উথলে পড়ল। চঞ্চল ও নগেন দুজনে দুটো বোতল নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেলল। এবং পরে তারা যে দোকানে গেল সেখানে পাওয়া যায় লাটু, লজেঞ্চুষ, রবারের বল ও মার্বেল। কিন্তু চঞ্চলের পুঁজি মোটে চার পয়সা আর নগেন হয়েছে বিনাপুঁজিতে তার পাণ্ডা। দোকানদারটাও একেবারেই দোকানদার। বারো আনার মোটর গাড়ী, এক পয়সাও ছাড়বে না, যতই দরাদরি

করো।

অতএব চার পয়সায় কি পাওয়া যায় সেইটেই হয় চঞ্চলের জিজ্ঞাস্য। অনেক জিনিষ পাওয়া যায়— ছুঁচ-সূতো, চাবির রিং, বোতাম, পেনসিল, রবার, সেফটিপিন, এমন কি একটা ভোঁতা ছুরি। কাঠের মনি-বাক্স কিনে উপরের ফুটোর ভিতর দিয়ে টুপ করে একটা পয়সা ফেলে দেবে, একটা একটা করে অনেক পয়সা জমাবে, তারপরে সেই সব পয়সা বের করে মোটর গাড়ী কিনবে, এই তার অভিলাষ। কিন্তু মনি-বাক্স চার পয়সায় হয় না।

অগত্যা কিছু লজেঞ্চুস কিনে নগেনকে অর্ধাংশ দিয়ে চঞ্চল সেদিনকার মতো বাসায় ফেরে।

অন্ধকার রাত্রে বন্ধ গাড়ীতে চড়ে চঞ্চল চলেছে রেল স্টেশনে। পথের ধারে দূরে দূরে এক একটি ল্যাম্পপোস্ট এক পায়ে দাঁড়িয়েছে আরতি-দীপ ধরে। গাড়ী ছুটেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে ল্যাম্পপোস্টও স্থির হয়ে নেই। সে যেন এক পথিককে আরতি করে অন্য পথিকের অভিমুখে অপসৃত হচ্ছে। ল্যাম্পপোস্টের সংখ্যা গুনতে গুনতে চঞ্চল যতই স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল তাদের সংখ্যাও ততই বাড়তে থাকল। শেষে এক সময় তারা হলো অগুনতি।

চঞ্চলের গাড়ীর মতো অনেক গাড়ী থেমেছে। লোকজন সোরগোল করছে। মনিহারীর দোকান, ময়রার দোকান, পান বিড়ি দেশলাইওয়ালা, নীলপোষাক পরা কুলী—এই সব দেখতে দেখতে চঞ্চল গেল টিকিটঘরে। সেখানে কেবল ধাক্কাধাক্কি হাঁকাহাঁকি চলেছে! কে আগে টিকিট কিনবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি। চঞ্চলের একজন আত্মীয় অভিমন্যুর মতো সেই ব্যূহ ভেদ করে অভিমন্যুরই মতো আর ফিরে আসেন না। এদিকে ট্রেন কখন এসে পড়বে ও চঞ্চলকে ফেলে যাবে সেই ভাবনায় চঞ্চলের মন অস্থির। প্ল্যাটফর্মের উপর তার ঠাকুমা জিনিসপত্র পাহারা দিতে দিতে তাকে কাছে টেনে রাখছেন, পাছে সে ছুটোছুটি করতে করতে লাইনের উপর ট্রেন-চাপা পড়ে।

টিকিট যখন এলো তখন চঞ্চল সেগুলোর আকার-প্রকার দেখে একটু নিরাশ হলো। এইটুকু জিনিসের এত দাম! এত দরকার! টিকিট না থাকলে নাকি ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে দেয়। পাছে তার হাত-ফস্কে হারিয়ে যায় সেজন্যে তার ঠাকুমা টিকিটগুলোকে নিজের শাড়ীর এক কোণায় শক্ত করে বাঁধলেন।

বারম্বার ঘণ্টা পড়লেও ট্রেন আসে না। লোকের ভিড় ও হট্টোগোল বাড়ে। একটি অপরিচিত মহিলা সদলবলে ঠাকুমার কাছে জায়গা নিয়ে আলাপ জমিয়েছেন। নিজের নাতি-নাতনীর ফর্দ দিয়ে ঠাকুমার কাছে চঞ্চলের পরিচয় নিচ্ছেন। চঞ্চল কিন্তু এক দৃষ্টে ও এক মনে ট্রেনের প্রতীক্ষা করছে। খুব দূরে একটা আভা দেখা দিল। তারপর ঝক্‌মক্ করে উঠলো একটা তারা। সেই তারা যতই এগিয়ে এলো ততই তার আয়তন

বৃহৎ হলো, জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে চঞ্চলকে ছুঁয়ে ফেলল!

এতক্ষণ রেলের লাইন ভালো করে চঞ্চলের নজরে আসেনি। এখন ঝল্‌সে উঠলো। চঞ্চলকে ভাববার সময় না দিয়ে হুস্ হুস্ করে ট্রেন যেন তার দিকে তাক্ করে ছুটে এলো। কি একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে ট্রেনের দিকে আকর্ষণ করলো। তার চোখের পাতা পড়ল না। ঠাকুমা তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলেন। এক নিমেষের মধ্যে সে যে কত কি দেখল তার হিসাব হয় না। শুধু এইটুকু বুঝল যে মাথায় আলোর টিপ পরা একটা কালো জানোয়ার উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে তার কাছ ঘেঁষে দৌড়িয়ে গেল। সেই বাহনের পিছু পিছু সংখ্যাতীত রথ আলো-ঝলমল হয়ে অফুরন্ত শোভাযাত্রা রচনা করল।

ট্রেন যখন থামল চঞ্চলের কল্পনায় তখনো সেই শোভাযাত্রার বিরাম হলো না, তার চোখ বিশ্বাস করল না যে বিরাম হয়েছে। ঠাকুমা তার হাতে টান দিয়ে বল্লেন, আয়, আয়, গাড়ী ছেড়ে দেবে। সকলে হুড়মুড় করে গাড়ীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, যারা নামতে চায় তাদের নামতে দিচ্ছিল না। চঞ্চলরা কোনমতে গাড়ীতে উঠে একটু জায়গা করে নিল।

গাড়ী কখন ছাড়বে এখন এইটেই হলো চঞ্চলের চিন্তা। সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চাইল ইঞ্জিনটা কত দূরে। কিন্তু ঠাকুমা তাকে টেনে নামিয়ে দিলেন। অবশেষে ট্রেন যখন হাঁফাতে হাঁফাতে ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করল ও চঞ্চল যে নদী নৌকা দিয়ে পার হয়েছিল সেই নদীর পুলের উপর দিয়ে দুমদুম দুড়দাড় করে দৌড় দিল তখন চঞ্চল ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙলো দেখলো ট্রেন তাকে নামিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভোর হয়ে আসছে একটা ছোট স্টেশনের খোলা ওয়েটিংরুমে। সামনে একটা পাহাড়। তার নাম মহাবিনায়ক, সংক্ষেপে মহাবিনা।

চঞ্চলেরা যে গাড়ীতে এসেছিল সেই গাড়ীতেই চঞ্চলের দূর-সম্পর্কীয় কয়েকটি ছেলে-মেয়ে এসেছিল, অন্য কামরায়। তাদের সঙ্গে চঞ্চলের ভাব হয়ে গেল। তখন সকলে মিলে 'লঙ্কাজড়া' গাছের ডাল ভেঙে গাছ থেকে ঝরতে থাকা ক্ষীরে ফুঁ দিয়ে বুদ্বুদ তৈরী করল।

একজনের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার নাম রমা দিদি। রমা দিদি আগে সেই পাহাড়ের উপর উঠেছে। সেখানে অনেক রকম বন্য ফল পাওয়া যায়। ঝর্ণা আছে। লোকে তীর্থ করতে যায়। কোনো হিংস্র জন্তু নেই। চঞ্চলের ইচ্ছা হল তার শিখরে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখতে। সে পাহাড়ী মানুষ, তার ভালো লাগে ঊর্ধ্বগতি। ঊর্ধ্ব থেকে পৃথিবী কেমন দেখায়, এই তার চির-কৌতূহল।

কিন্তু চঞ্চলকে যেতে হলো বিপরীত দিকে। রমা দিদির বাড়ী যে গ্রামে সেই গ্রামে চঞ্চলের পিসিমার বাড়ী। আবার গোরুর গাড়ীতে চড়া। কিন্তু এবার জঙ্গলের ভিতর

দিয়ে নয়। এবার ধানের ক্ষেত, ছোট বড় গ্রাম, বট অশ্বত্থ আম কাঁঠাল বাঁশ ইত্যাদি গ্রাম্য গাছ, কোথাও মন্দির, কোথাও গাছতলায় গ্রামদেবতা, হাটবাজার পাঠশালা। পথে যেতে যেতে নদী নালা দু-তিনটে। সব কটাতে পুল নেই। জল শুকিয়ে এসেছে বলে নৌকাও নেই। গোরুর গাড়ী গাঙের উপর দিয়ে চলল।

রমা দিদি চঞ্চলকে সমস্ত চিনিয়ে দেয়। ওসব পরিচয়ের সঙ্গে চঞ্চলের জংলী অভিজ্ঞতার মেলে না। মেলে না বলে খুব আশ্চর্য লাগে।

সেই গ্রামে চঞ্চলের পিসিমার বাড়ী। তিনি তাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু তাঁর ছেলে এসে চঞ্চলকে পাকড়াও করল।

চঞ্চল ভাবল, ও বাবা, এ কোন দেশী বুলি ? এর তো একবর্ণ বুঝতে পারিনে।

"ইক্ মনা রতো ? লব্, লব্।" চঞ্চল তো হতভম্ব !

"বুঝতে পারলিনে ? তোর নাম কি ? বল্ বল্ ?"

চঞ্চল বুঝতে পেরে হেসে উঠল। উত্তর দিল, "আমার নাম চঞ্চল। ইক্ মনা রতো ?"

"ছুমি ছুকি মনা রমাআ !"

চঞ্চল আশ্চর্য হয়ে বলল, "কিছু-মিছু সেটা কি একটা নাম হতে পারে ?"

"আলবৎ পারে। চঞ্চল যদি মানুষের নাম হয়, তবে কিছু-মিছু খাসা নাম !"

চঞ্চল ভাবল, নিজের প্রকৃত নাম না বলাটাই এ দেশের রীতি। আমি নিজের প্রকৃত নাম বলে বড্ড ঠকে গেছি। বলল, "আমার নাম চঞ্চল বুঝি ? তোর শ্রবণ-শক্তি তো বেশ তীক্ষ্ণ ! বলি আমার নাম— (চঞ্চলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো)— য়্যাংকড়া।"

"কি বল্লি ? আবার বল্ !"

"য়্যাং— য়্যাংকড়া।"

তৎক্ষণাৎ চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল একটা বনমানুষ এসেছে, তার নাম য়্যাংকড়া। গ্রামের ছেলেমেয়েরা দলে দলে য়্যাংকড়া দেখতে ছুটে এল। হুলুস্থুল ব্যাপার।

চঞ্চলের দিকে সাহস করে কেউ ঘেঁষতে পারে না। পিসতুত ভাই কিছু-মিছু তাদের সাবধান করে দিয়েছে, য়্যাংকড়া মানুষের মাংস খায়। চঞ্চল ভদ্রতার সঙ্গে যতই বলে, "এসো" তারা ততই পেছিয়ে যায় ও সভয়ে তাকায়।

অপদস্থ হয়ে চঞ্চল ঠিক করে ফেলল, এমন গ্রামে আর এক মুহূর্ত নয়। সে ঠাকুমার কাছে সব কথা বলতেই তিনি বল্লেন, "অম্বর তোর চেয়ে ছ'মাসের বড়, তোর দাদা। পাড়াগাঁয়ে থেকে যত সব অসভ্যতা শিখছে। ওকে আমরা প্রতাপগড়ে নিয়ে যাবো।"

অম্বর চঞ্চলকে বলল, "ওরে য়্যাংকড়া, গুটি খেল্‌বি ?"

চঞ্চল বলল, "সেটা কি খেলা ?

একটা কাঠের কিম্বা বাঁশের লম্বা টুক্‌রাকে একটা উঁচু জিনিসের উপর— ধরো একখানা ইটের উপর— এমনভাবে রাখতে হয় যেন টুকরাটার সেই দিকে একটা ঘা দিলে টুকরাটা লাফ দিয়ে ডিগ্‌বাজি খেয়ে নির্দিষ্ট এক জায়গায় পড়া চাই।

চঞ্চলকে অম্বর ছুরি খেলাও শেখাল। 'ছুরি' নাম শুনে কেউ যেন না মনে করেন এর উপকরণ পেনসিল-কাটা ছুরি। 'ছুরি' বলে খেলোয়াড়রা চেঁচিয়ে ওঠে, সেই থেকে খেলার নাম 'ছুরি'। খেলতে হয় উঠানের উপর ছাইয়ের ছক কেটে, দল বেঁধে। সেই সূত্রে গ্রামের বহু ছেলের সঙ্গে য়্যাংকড়ার ভাব হয়ে গেল।

নদীর বালুর উপর হাডুডু খেলাতেও য়্যাংকড়া যোগ দিল। ঘন গাছের ছায়াশীতল গ্রামটি— তার একধারে নদী, অন্যধারে সরকারী কেনাল। ফসল নয়ত, সোনা ফলে। পাহাড়ীদের তুলনায় এদিকের লোক সুখী। গ্রামে গ্রামে যাত্রার আখড়া।

অম্বরদাকে নিয়ে চঞ্চল প্রতাপগড়ে ফিরল। পড়াশুনায় অম্বরদা পেছিয়ে পড়েছিল, চঞ্চলের নীচের ক্লাসে ভর্তি হল। কিন্তু কেমন করে রটে গেল সে মস্ত পণ্ডিত! 'এই পণ্ডিত' 'এই পণ্ডিত' বলে স্কুলের ছেলেরা যখন তাকে ঘিরে দাঁড়ায় সে তখন চোখ পাকিয়ে গুরুগম্ভীর গর্জনে বলে, ''নেস্‌রিক লগো, লাপা।''

ছেলেরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। কি এর অর্থ? কি ঐ ভাষার নাম— সংস্কৃত না আরবী না চীন! একমাত্র চঞ্চলই ও ভাষা বোঝে, একমাত্র সেই সাহস করে পণ্ডিতের সঙ্গে ঐ ভাষায় ভাঙা ভাঙা কথা বলে।

কিন্তু ধরা পড়তে পণ্ডিতের দেরী হলো না। তখন তার নাম বদলে হলো 'তণ্ডিপ'।

অম্বরদা দেখতে দেখতে ফুটবলের ক্যাপ্টেন, হাডুডুর সর্দার ইত্যাদি জনপ্রিয় পদগুলি দখল করে চঞ্চলকে আড়াল করে দাঁড়াল। সে যে চঞ্চলের দাদা ও বন্ধু এজন্য চঞ্চল গর্ববোধ করল। তাকে খুসী করবার জন্য চঞ্চল নাটক লিখল; সে নিল নায়কের ভূমিকা। নেপাল তার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে না পেরে তার বশ্যতা স্বীকার করল। ভারত তার এক 'পট্‌কন' খেয়ে মাথা ঘুরে মাটি কামড়াল। পণ্ডিত তো নয়, পালের গোদা। সবাইকে তার দলে ঢুকতে হলো, তার হুকুম্ মান্‌তে হলো।

একদিন চঞ্চল তার নূতন ক্লাসে বসে আছে, এমন সময় উপরের ক্লাসের একটি ছেলে এসে তাকে বলল, ''এস, আমাদের মাস্টার তোমাকে ডাকছেন।''

চঞ্চল যেতেই তিনি বল্লেন, ''তুমি কাল থেকে এই ক্লাসে এসে বসো।'' অর্থাৎ ডবল প্রমোশন।

দুঃখের বিষয় এই যে, একটু দেরিতে হলো। চঞ্চল তাঁকে স্যালিউট করে যেই চলে যাবে অমনি তার হাত লেগে একজনের দোয়াত উল্টলো। চঞ্চলকে পিছু ডেকে তিনি বল্লেন, ''কি হে, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!''

চঞ্চল ভাবল এর জন্য একদিন সাজা পেতে হবে। পরের দিন সে যখন সেই

ক্লাসে জায়গা খুঁজল তখন প্রায় ছেলেরই তার উপর ঈর্ষা আর বিরাগ। কেউ তাকে কাছে বসায় না। যে ছেলেটা লাস্ট বয়, যাকে সকলেই কৃপাচক্ষে দেখে, সেই ছেলেটি চঞ্চলের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাকে নিজের বেঞ্চিতে এক ইঞ্চি জায়গা দিল। অর্থাৎ লাস্ট বয় হবার গৌরব-মুকুট চঞ্চলের মাথায় পরিয়ে দিল।

দিন সাতেক পরে মাস্টার মশাই ফার্স্ট বয়ের কাছে প্রশ্নের যথোচিত উত্তর না পেয়ে সেকেণ্ড বয়কে সেই প্রশ্ন করলেন। সেও ভুল উত্তর দিল। তারপরের ছেলেরা নিরুত্তর। প্রশ্নটি যখন চঞ্চলের কাছে এসে পৌঁছল তখন চঞ্চল বলল, "Box করা মানে মুষ্টিযুদ্ধ করা।"

মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কোনো মানে হয়?" চঞ্চল বলল, "কান Box করা মানে কানে চড় মারা।"

তিনি বল্লেন, "তবে সকলের তাই করতে করতে ফার্স্ট সীটে উঠে এসো।"

লাস্ট বয় তার কানে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "আমি তোকে জায়গা দিয়েছি। আমারটা আস্তে। ওদেরগুলো খু-ব জোরে জোরে।"

চঞ্চল তার কথা রাখল। কিন্তু ত্রিশ বত্রিশ জোড়া কান সজোরে মর্দন করা সামান্য মানুষের কর্ম নয়, মুষ্টিযোদ্ধার পক্ষেই সম্ভব। চঞ্চল মনে মনে আফসোস করে বলল, "আহা, হয়ে থাকতুম যদি অম্বরদার মতো পালোয়ান তবে কি স্বর্গীয় আনন্দই না অনুভব করতুম। এমন সুযোগ জীবনে দুবার আসে না।" যতই সে ফার্স্ট বয়ের দিকে এগিয়ে চলল ততই তার কব্‌জি কন্‌কন করতে লাগল, হাত কাঁপতে লাগল। কোনোমতে দুই হাতে কান দুটোকে ছুঁয়ে সে কর্ণ-মর্দন অনুষ্ঠানটার নাম রক্ষা করল।

কুতবমিনারের চূড়ায় উঠলে যেমন প্রতিমুহূর্তে মনে হতে থাকে এইবার পড়লুম, এইবার পড়ছি, তেমনি ফার্স্ট সীটে বসে চঞ্চলের ভয় হলো, এইবার কান দুটির উপর সারা ক্লাসের নেকনজর। বেহুঁশিয়ার একটা ভুল কর্‌লে আর রক্ষা নেই। চঞ্চলের চেয়ে আকারে ও বয়সে ওরা সবাই বড়। লাস্ট বয়টা তো একটা ষণ্ড। কানদুটো থেকে যে মানুষের সোয়াস্তি নেই এই ভেবে চঞ্চল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

অন্যান্য ছেলেরাও বোধ করি কানে হাত বুলাতে বুলাতে ফিস ফিস করে বলাবলি করছিল যে, "ভালোই হলো। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। নিজের কান সামলানোর জন্যই ঐ হতভাগাটাই এখন থেকে আমাদের সকলের হয়ে পড়া তৈরী করবে। আর ও যদি ভুল করে তবে আমরা সকলেই ভুল করব।"

খুসী হলো একমাত্র লাস্ট বয়। ক্লাসের শেষে চঞ্চলকে ডেকে নিয়ে বলল, "ওদের সকলের কানমলা খেয়ে খেয়ে আমি তো এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছি। তুই আমার কানে হাত দিয়ে এমন কিছু নূতনত্ব দেখাসনি, কিন্তু ওদের সকলের কান রগ্‌ড়ে দিয়ে আমার জ্বালা গায়ের মিটিয়েছিস্।"

পরের দিন ক্লাসে গিয়ে চঞ্চল তার পুরাতন সীটে বসল। ফার্স্ট সীটে বসতে

তার লজ্জা করছিল, ভয়ও। লাস্ট বয় বলল, "খবরদার! এ বুড়ো বয়সে আর কানমলা সহ্য হবে না, তুই আমার এদিকে বস।"

লাস্ট বয়ের উপরের সীটে যে ছেলেটি বসেছিল সে চমকে উঠে বলল "অসম্ভব। আমার কান এখনো জ্বালা করছে। তুমি আমার এপাশে বসো।" এমনি করে প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে উঠে চঞ্চলকে নিজের উপরের সীটে বসিয়ে দেয়।

চঞ্চলের বাবা ও বিজয়কাকা দুজন ধুরন্ধর ডিপ্লোম্যাটের মতো ইউরোপের মানচিত্রখানার উপর ঝুঁকে পড়ে আঙুল বুলাচ্ছিলেন ও একজনের কথায় অন্যজন ঘাড় নাড়ছিলেন। তাঁদের কথাবার্তা শেষ হলে চঞ্চল বিজয়কাকাকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কাকা, কী হয়েছে?"

"তুই ছেলেমানুষ, ওসব বিষয়ের কী বুঝবি?"

"আমি বুঝি না বুঝি, তুমি বল না শুনি।"

"অস্ট্রিয়ার যুবরাজ খুন হয়েছেন। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার চরকে সন্দেহ করে সার্বিয়ার সঙ্গে লড়াই করতে যায়। দেখে রাশিয়া নিয়েছে সার্বিয়ার পক্ষ।"

চঞ্চলের এক সহপাঠীর কাকা থাকেন আমেরিকায়। ছাত্র অবস্থায় পালিয়ে গেছেন, গিয়ে সেখানে এখন চিনি তৈরীর কাজ শিখছেন। পাতালে যে মানুষ থাকে ও তাদের মধ্যে একজন এই প্রতাপগড়ের মানুষ, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—কারণ চঞ্চলের ভূগোলেই তো ক্যালিফর্নিয়ার উল্লেখ আছে আর তার য়্যাটলাসে আছে ও-দেশের ছবি। নিজের য়্যাটলাসখানাকে চঞ্চল খুবই ভালোবাসে, কিন্তু সুযোগ পেলে পরের য়্যাটলাস নিয়েও নাড়াচাড়া করে।

চঞ্চলের বাবা 'বসুমতী' সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক। চঞ্চল ঐ কাগজে মহাযুদ্ধের বর্ণনা মন দিয়ে পড়তে সুরু করে দিল আর নেপালের য়্যাটলাসখানা বারম্বার চেয়ে নিয়ে চোখের কসরৎ করতে থাকল। 'বসুমতীর' উপহার হিসাবে তার বাবা আনলেন ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান, রুশ-জাপানী ও বলকান যুদ্ধের ইতিহাস। চঞ্চল ও-বই গ্রাস করল।

ইংলণ্ড বেলজিয়ামের উপর জার্মানীর অন্যায় আক্রমণ দেখে স্থির থাকতে পারেনি, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। তার ফলে চঞ্চলের বাবা আফসোস করে বলেছেন, "ভাইয়ে ভাইয়ে আবার কুরুক্ষেত্র! পরিণামে উভয় পক্ষের সর্বনাশ অনিবার্য।"

চঞ্চল একথা শুনে বিজ্ঞের মতো বলেছে, 'বাচ্চা বেলজিয়াম কার কী করেছিল? নিরীহের উপর অত্যাচার আমাদের সম্রাট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন, ওটা কি একটা কথা হলো!"

যুদ্ধ বাধবার খবর তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কেন বাধল, কার সঙ্গে কার আগে বাধল— অত খুঁটিনাটির মধ্যে কেউ যায় না। শুধু জানে ইংরাজের সঙ্গে

জার্মানীর যুদ্ধ—জার্মান ভারি জোর লড়াই করছে। কোথায় যে লড়াইটা হচ্ছে তাও কারুর জানতে বাকী নেই— দিল্লীর কাছে। বুড়ো রাম সিং চঞ্চলকে জিজ্ঞাসা করে, "হাঁ বাবু, তুমি তো গেজেট পড়। বল দেখি জার্মানী এখন কত দূর এসেছে! আমি তো গুজব শুনছি—কলকাতা পর্যন্ত!"

রাম সিং একজন প্রসিদ্ধ গুলীখোর। তার যিনি মনিব তিনি চঞ্চলের বাবার মতে ভারতবর্ষের দু-তিনজন সেরা বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিলেন। গুলী খেতে খেতে তাঁর বুদ্ধিটা হয়েছে ঘায়েল। বর্মাদেশে তাঁর মস্ত চাকরি ছিল, তারপরে একে একে ভারতবর্ষে এমন রাজ্য নেই যেখানে তিনি চাকরি করেন নি। রাম সিং এঁর সাগরেদি করে সন্ধ্যাবেলায়। সেই সময় গুজব শোনে সারা দুনিয়ার।

চঞ্চল উত্তর দেয়, "রামসিং, তুমি বুড়োমানুষ, এসব বিষয়ে কী বুঝবে? ভূগোল তো কোনদিন পড়লে না, মানচিত্র তো কোনোদিন দেখলে না! কেমন করে তোমাকে বোঝাবো যে জার্মানরা এখন উত্তর ফ্রান্সে!"

রামসিং বলে, "হুঁ। জান আমার বাবুর মাথা গবর্ণমেন্ট এখন থেকে কিনে রেখেছে! একদিন ঐ মাথার খুলির নীচে কোনখানে এত বুদ্ধি লুকানো ছিল তার খোঁজ হবে। বাবু বলেন কলকাতা, আর তুমি বলছ—কী—কী—"

"ফরাসী দেশের উত্তর।"

"হাঁ, হাঁ, করাসডাঙ্গার উত্তর।"

এই বলে রামসিং গান ধরে:

"গোল গোল কালো কালো
তার নেশা বড় ভালো।"

গান শুনে হাসতে হাসতে চঞ্চলের দম আটকে যাবার মতো হয়। তখন রামসিং খোসমেজাজে গলা ছাড়ে:

"আরে—গুলী খেয়ে মাথার খুলি
বেচেছে বি গাঙ্গুলী
(B. Ganguli)"

নেপালদের মাস্টারমশাইয়ের কাছে চঞ্চলরা গিয়ে রাত্রে পড়া করে। ভদ্রলোক 'busy'র উচ্চারণ শেখান 'বজী'। তিনি গুলী না খেলেও তাঁর মতো বানিয়ে গল্প বলতে গুলীখোররাও পারে না। যুদ্ধে জার্মানী যে কি রকম ওস্তাদী দেখাচ্ছে তার টাট্‌কা খবর তিনি ডাকঘরে গিয়ে পান ও পাড়াশুদ্ধ সবাইকে শুনিয়ে বেড়ান। জার্মানের সঙ্গে ইংরেজ পারবে কেন? জার্মান এই মাটিতে তো এই আকাশে! এই আকাশ থেকে বোমা ছোঁড়ে তো এই পাতাল থেকে ভূমিকম্প ঘটায়। মেঘের উপর থেকে ইন্দ্রজিৎ যেমন লড়াই করে লক্ষ্মণকে নাকাল করেছিল তেমন রণকৌশল জার্মান জানে। কারণ জার্মান পণ্ডিতেরা সংস্কৃত পুঁথি থেকে মন্ত্রগুলি খুঁজেপেতে বের করে নিয়েছে।

সংস্কৃত বই আমাদের দেশে যা আমরা পাই তার সারবস্তু বহুদিন পূর্বে জার্মানীতে চলে গেছে!

"তোমরা ভাবছ তা কেমন করে হলো?" চিন্তামণি মাস্টার বালকদের প্রশ্ন করেন ও মৃদু হেসে নিজেই তার উত্তর বলে দেন, "পুরাকালে ভারতবর্ষে তিন ভাই ছিল, তাদের নাম শর্মণ, বর্মণ, জর্মণ। শর্মণ ও বর্মণ এই দেশেই থেকে যায়, তাদের বংশধরদের বলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। জর্মণ দেশান্তরে চলে যায়, তার বংশধর হচ্ছে জার্মান। যাবার সময় জর্মণ কি শুধু হাতে গেছল? না, তা অবিশ্বাস্য। জর্মণ নিশ্চয়ই বস্তা বস্তা সংস্কৃত পুঁথির মন্ত্রতন্ত্র সরিয়েছিল। তাই থেকে আজ ওরা বানাচ্ছে যন্ত্র। ঐ যাকে এরোপ্লেন বলছে ওটা আমাদের পুষ্পক-রথ ছাড়া আর কী!"

নেপাল ভূপাল ভারত, এমন কি নির্মল, এমন কি চঞ্চলের বন্ধু "পণ্ডিত" দাদা সগর্বে প্রতিধ্বনি করে, তা ছাড়া আর কি!

একা চঞ্চল প্রতিবাদ করে সকলের অপ্রিয় হয়।

মধ্যরাত্রে চঞ্চলের ঘুম ভেঙে গেল, সে চেয়ে দেখলে চারিদিক আলোয় আলোময়। তার গায়ে লাগ্‌ল সেই আলোর তাপ। আলো নয় আগুন। আগুন দেখতে দেখতে চঞ্চলের গায়ের কাছে ছুটে এলো। সে ভয়ে বুদ্ধি হারিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠবে কি না স্থির করতে পারছে না, এমন সময় শুন্‌ল, "পালা, পালা, প্রাণ বাঁচা।"

তার কাছে যারা শুয়েছিল তাদেরও বিমূঢ় অবস্থা। তবু বাঁচতে হবে তো। দৌড়, দৌড়, ওরা সকলে গিয়ে উঠল একটা টিলার উপর, সেখানে নেপালরাও এসে আশ্রয় নিল। পালাবার সময় গায়ের লেপ কম্বল বা শাল আলোয়ান, এমন কি একখানা কোর্তা পর্যন্ত নিয়ে যেতে ভুলে গেল। কেবল 'পণ্ডিতের' গায়ে একখানা কোট। টিলার ওপর বসে পৌষের প্রখর শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে তারা দেখতে লাগল রোশনাই। দুই বাড়ীরই খড়ের চাল, নিঃশেষে পুড়তে সময় লাগবার কথা নয়। বাঁশগুলো পুড়তে পুড়তে শব্দ করছিল বিকট। আগুন ক্রমশঃ মন্থর হয়ে এলো, তার রং হলো উজ্জ্বল লাল, তারপর ঘোর লাল, তারপর কালো-লাল। তাপ তার মাটির মধ্যে ঢুকে অনেকক্ষণ রইল।

গৃহদাহের দেবতাকে ওদেশে বলে "হিঙ্গুলা"। শীতকালে তাঁর আবির্ভাব কদাচ ঘটে, কাজেই তখন তাঁর পূজার সময় নয়। গ্রীষ্মকালে "হিঙ্গুলা"কে 'পনা' (সরবৎ) না খাওয়ালে কি রক্ষা আছে? চঞ্চলরা এতদিন তাঁকে বড় একটা গ্রাহ্য করেনি, তবু যে চঞ্চলদের ও নেপালদের বাড়ী দুখানা এতদিন তিনি জিভ্ দিয়ে চেটে খাননি তার কারণ বোধ করি এই যে পাড়ার অন্যান্য বাড়ীর থেকে এ দু'খানা বাড়ীর ব্যবধান কিছু বেশী।

ভোর হলো। কাল যেখানে বড় বড় বাড়ী দাঁড়িয়েছিল সেখানে রইল ছাইয়ের গাদা। সব চেয়ে করুণ দৃশ্য ভস্মীভূত গোরু। গোয়ালে অন্য যে কয়েকটি গাই গরু

আধপোড়া অবস্থায় বাঁধন ছিড়ে বা খুঁটি উপড়িয়ে পালাতে পেরেছিল তারা আর ফিরতে চায় না ভয়ে।

কেমন করে আগুন লাগল, কেউ কি হিংসা করে আগুন দিল, কে প্রথম সে আগুন দেখল, কেউ কি সেই হিংসুটে লোকটাকে দেখেছে—এই রকম নানা গবেষণার পর যখন ক্ষিদে পেয়ে গেল তখন মুখে দেবার মতো কিছু নিকটে পাওয়া গেল না। ময়রা-কাকা দয়া করে মিষ্টান্ন খাওয়ালেন, দূরবর্তী দয়ালু প্রতিবেশীরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন।

দুঃখের দিনে নেপালের সঙ্গে চঞ্চলদের ভারি বন্ধুতা হয়ে গেল। তারপর সে বন্ধুতা স্থায়ীও হলো। দুই পরিবারের কর্তারা স্থির করলেন পাকা বাড়ী বানাবেন। প্ল্যান এস্টিমেট তৈরী করতে চঞ্চলের এক কাকাকে তাঁর কলেজের ছুটিতে বলা হলো। তাঁর হিসাবে ছয়শো টাকা খরচ করলে ছোট একখানা পাকা বাড়ী হয়। কাজ আরম্ভ করে দেখা গেল যে ছয়শো টাকা ধার করা গেছল তাতে একেবারে কুলায় না। বছরের পর বছর যায়, কোথাও কিছু ধার পাওয়া গেলে কাজ চলে, নইলে বন্ধ থাকে। নেপালের বাবা টাকা সংগ্রহ না করতে পেরে কেবল ভিত্তি স্থাপন করে ক্ষ্যান্ত দিলেন। চঞ্চলের বাবা হাল ছাড়লেন না, বছর চারেক পরে তাঁর বাড়ীতে কোনোমতে ছাদ উঠল। নেপালদের যে ঈর্ষা না জন্মালো তা নয়। তারা বলল, ধার করে দালান দেওয়া সোজা। তবে সে দালান কার ভোগে লাগবে সেইটে আগে থেকে জানা শক্ত—মালিকের না মহাজনের?

মহাযুদ্ধের মজা বছর না ঘুরতেই মালুম হলো। কোনো পক্ষই হারবার পাত্র নয়, দুপক্ষে অন্যান্য দেশ যোগ দিল। এদিকে সব জিনিসের দাম গেল বেড়ে। না আছে বাড়ী, না আছে যথেষ্ট খাদ্য। দামী কাপড়ের দাম দেওয়া যায় না বলে চঞ্চলের বাবা ওদের মস্ত মোটা খদ্দর করিয়ে দিলেন। তখনকার দিনে খদ্দরের চলন ভদ্রসমাজে হয়নি, চঞ্চলরা লজ্জায় মনমরা হয়ে থাকে। এসব দুঃখ-দুর্দশার চেয়ে চঞ্চলের কাছে বড় ছিল তার পুড়ে যাওয়া লাইব্রেরীটার অভাব। লাইব্রেরীর নোঙর না থাকাতে তার জীবন ভাসমান নৌকার মতো নিরাশ্রয় হলো।

বৃন্দাবন থেকে একদিন এক বাবাজী এলেন, তিনি বল্লেন, "তোমরা রোজ ভোরে উঠে গুরুজনকে প্রণাম করো যদি, তবে মাসান্তে তোমাদের একটি খোল পুরস্কার দেবো এবং বাজাতে শেখাব।"

পরদিন ভোরে গুরুজনরা ভাবলেন, হলো কী? নেপাল ভূপাল চঞ্চল নির্মল শুধু যে নিজ বাপ-মা'কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছে তা নয় যেখানে যাকে পাচ্ছে তার পথ আটকে তার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ। তাঁরা শুনলেন প্রতাপগড়ে কে এক মূর্তি সাধু এসেছেন, তাঁর এই শিক্ষা। সাধুকে তাঁরা খুব আদর আপ্যায়ন করে একটা মঠের

মোহন্ত করে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মাস যখন পুরল তখন "কই বাবাজী, খোল কই"? শুনে বাবাজী বল্লেন, "খোলের জন্য আমি তোমাদের বলেছি, তাঁরা চাঁদা দিলেই আমি কিনে দেবো।" যাক্, খোল যদি বা চাঁদার টাকায় হলো, "এখন বাজাতে শিখিয়ে দিন" বলে দুবেলা তার আস্তানায় হাজিরা দিতে বইপত্র খোলবার সময় থাকল না।

বাবাজী ততদিনে একটা কীর্তনের দল গড়েছেন এবং সুগায়ক বলে জনপ্রিয় হয়েছেন। চঞ্চলরা তাঁর দলে ভিড়ে গেল ও প্রতি সন্ধ্যায় নগরকীর্তন করতে গিয়ে পথে পথে বাহু তুলে নাচতে সুরু করে দিল। "গোরা গোরা গোরা" বলে তারা গলা ছেড়ে এমন গান জুড়ল, স্কুলের মাস্টারমশাই তাদের পড়াশুনার আশা ত্যাগ করলেন। কেবল হেডমাস্টার মশাই তাদের দেখলে টিপে টিপে হাসেন। তাঁর মনোভাবটা এই যে, প্রমোশনের দিন যদি বাহু তুলে নাচতে পারো তবে জানব তোমার হরিভজন খাঁটি।

প্রতাপগড় যখন স্বাধীন রাজ্য ছিল তখন তার ছিল বহু সহস্র পদাতিক বা পাইক। করদ রাজ্য হবার পর থেকে যুদ্ধবিগ্রহ নেই, পাইকরা নিষ্কর জমি চাষ করতে করতে যুদ্ধবিদ্যা ভুলেছে। তবে তারা সম্পূর্ণ ভোলেনি তাদের রণনৃত্য। গোড়াতে যা রণনৃত্য ছিল তার সঙ্গে রূপকথা ও পুরাণ যোগ দিয়ে তাকে করেছে লোকনৃত্য। এই লোকনৃত্যকে বলে ছউ নাচ। এতে গান নেই, আছে বাজনার তালে তালে পদক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গী। এতে কথাও নেই, আছে ভাবাভিনয়। গ্রামে গ্রামে ছউ নাচের দল একদা ছিল, অধুনা লোপ পাচ্ছে। অত্যন্ত কায়িক শক্তিসাপেক্ষ এ আমোদ। পাইকরা গরীব চাষা, তাদের খাটতে হয় সারাটা দিন। রাত্রে বাড়ী ফিরে কঠিন নৃত্য করতে কি পা ওঠে? তা ছাড়া চাষেও এমন লাভ নেই, পেট ভরে খেয়ে শরীরটাকে কঠিন কসরতের উপযুক্ত করে গড়বে।

মাঝখানে রাজার আগ্রহে ও অর্থব্যয়ে তারা নাচ দেখিয়েছিল। তখন প্রত্যেক রাত্রে চঞ্চল যেত রাজবাড়ীতে। কোনোদিন হরধনুভঙ্গ, কোনোদিন রাম-রাবণের যুদ্ধ, কোনোদিন বিদ্যাসুন্দর। পালা তার অজানা বা অদেখা নয়—কিন্তু নৃত্যবাদ্যের ছন্দ অভিনব। বার বার দেখে তৃপ্তি হয় না। এ ধরণের জিনিস কোথাও আর দেখতে পাওয়া শক্ত। তবে এর আভাস আছে উদয়শঙ্করের যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি নৃত্যে।

রাজবাড়ীর অতিথি হলেন শ্রীশ্রীভূমানন্দ ভারতী।

ইনি সন্ন্যাসী নন, সন্ন্যাসিনী। বেশভূষা সন্ন্যাসীরই মতো, কেবল মাথায় বড় বড় চুল—তবে মেয়েদের চুলের মতো লম্বা নয়। এঁর পায়ে সারাক্ষণ খড়ম খট খট করছে। খড়ম পায়ে দিয়ে দাঁড়ালে এঁর উচ্চতা হয় প্রায় ছয় ফুট। সুপরিপুষ্ট শরীর। বয়স যদিও পঞ্চাশের কোটায় তবু দিব্য বলিষ্ঠ গড়ন। আশ্চর্যের বিষয়, এই ভদ্রমহিলা

বাঙালী। শুধু তাই না, ইনি ভারতবর্ষের প্রায় ভাষাই জানেন, অধিকন্তু জানেন ইংরাজি। এঁর সঙ্গে যে লাইব্রেরীটি ঘুরছে সেটি সামান্য নয়। আর এঁর সঙ্গে ঘুরছেন এঁর কন্যা সুনন্দা দেবী। সুনন্দা দেবী মা'র কাছে পড়াশুনা করেন। তাঁর এক জোড়া ডাম্বেল আছে। সেই ডাম্বেল হাতে নিয়ে সামনে চার্ট ঝুলিয়ে তিনি কসরৎ করেন। তিনি খানকয়েক কবিতার বইও লিখেছেন, ছাপা হয়েছে।

চঞ্চলের বাবা ভারতী মহাশয়ার সঙ্গে আলাপ করে এসে তাঁদের সম্বন্ধে এই সব সংবাদ যখন দিলেন তখন চঞ্চল বলল, ''আমি আলাপ করব।''

চঞ্চলকে তার বাবা ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বল্লেন, ''আমার এই ছেলেটি খুব পড়ে, দেশ-বিদেশের খবর রাখে খুব।''

ভারতী তার হাত দুটোতে মোচড় দিতে দিতে বল্লেন, ''এমন দুবলা পাতলা কেন ? দেখ গিয়ে তোমার পিসীমা ডাম্বেল করেন !''

পিসীমার বয়স বছর পঁচিশ হবে। এঁর জীবন বড় দুঃখের। ভুলতে চেষ্টা করছেন। চঞ্চলকে তাঁর ডাম্বেল আর লাইব্রেরী দেখালেন। বল্লেন, ''তুমি মাঝে মাঝে এসো, চঞ্চল। এসে যা খুসী পোড়ো।''

চঞ্চল ভাবছিল রোজ আসতে পারলে বেশ হতো, কিন্তু ইনি তো বল্লেন ''মাঝে মাঝে''। এর পর বেশী আসা ভালো দেখায় না। কিন্তু বইগুলির উপর এমন লোভ হচ্ছিল !

ইতিমধ্যে সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আবিষ্কার করেছিল। সুনন্দা দেবী আর একজন কবিকে চিনিয়ে দিলেন— দেবেন্দ্রনাথ সেন। বাংলা মাসিকপত্র তিনি পেতেন ও নিতেন রাশি রাশি। চঞ্চল সেগুলির পোতা উল্টায় আর মরীয়া হয়ে ওঠে। কত পড়বার আছে, জানবার আছে, শেখবার আছে, দেখবার আছে। তবু ইনি বলেন, মাঝে মাঝে ! এত ছবি, এত গল্প, এত কবিতা, এত ভ্রমণ-কাহিনী, এত বড় বড় বিষয়ে প্রবন্ধ—চঞ্চল যেন পাগল হয়ে যাবে।

সুনন্দা দেবী মৃদু হেসে বল্লেন, ''আচ্ছা, তুমি ওর যতগুলি বয়ে নিয়ে যেতে পারো বাড়ী নিয়ে যাও, কিন্তু আমার কাছে পড়ার পরীক্ষা দিতে হবে।''

তা হলে তো বিপদ ! চঞ্চল কোনটা কোনটা নেবে, বাছাই করতে লাগল। একটার একটুখানি পড়ে দেখে, নাঃ, বোঝা যায় না। শিলালিপি, তাম্রশাসন, এসব কথার মানে কী ? গীজো ও গিবন—এরা কি মানুষ না বানর ? সনেট—সনেট বোধ হয় এক রকম ফল। তা নইলে পরিপক্ক লিখেছে কেন ? বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ—ওটা নাকি একটা ছোট গল্প। ''না, পিসীমা'', চঞ্চল মনে মনে প্রণাম করে বলল, ''আমার মাইন, সাবমেরিন, ট্রেঞ্চ এর চেয়ে অনেক সোজা।''

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চঞ্চলের রুচি অন্য জাতের হয়ে উঠেছিল। ডিটেকটিভ উপন্যাস পেলে সে খেতে শুতে হেলা করত। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

পড়তে পড়তে সে ভাবত সে নিজেই যেন উপন্যাসের বীর। গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক পড়ে সে বীরত্বের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত।

তা নয় তো, 'পুরবৈয়াঁ'! 'সনেট' ফল। তাম্রশাসন! কী একটা উপন্যাস—তাতে যুদ্ধ নেই, ষড়যন্ত্র নেই, খুন নেই, ধরপাকড় নেই।

চঞ্চল নিজেই একটা হাতে-লেখা মাসিকপত্র বার করল। তার সহায় হলো অম্বর, নির্মল, ভারত, নেপাল ইত্যাদি সমবয়সীগণ। সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখল চঞ্চল স্বয়ং : "আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে"—"আমরা জিজ্ঞাসা করি, জার্মানী লুসিটেনিয়া জাহাজ ডুবাইয়া দেয় কেন?" ইত্যাদিও থাকে। বেশীর ভাগই এখান থেকে তর্জমা, ওখান থেকে চুরি। বিজ্ঞাপনও থাকে—অন্যান্য মাসিক থেকে টুকে নেওয়া। তা ছাড়া চঞ্চলের অলিখিত গ্রন্থ, নেপালের অনারব্ধ উদ্ভাবন, অম্বরের বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা—"অম্বর এণ্ড কোং লিমিটেড"। চঞ্চল মনে মনে যে সব বই লিখে ফেলেছে সেগুলির মধ্যে নাটকই বেশী। ডিটেকটিভ উপন্যাসও কম নয়। "চিতোরসূর্য, দিল্লীশ্বর, সায়েস্তা খাঁর শাস্তি, হত্যাকারী কোথায়? জাল উমিচাঁদ"।

এ এক মন্দ তামাসা নয়। একদিন এই সাহিত্য পরিষদের এক বৈঠকে নেপাল বললো, "আমাদের এমন প্রতিভা, এ কি হাতে-লেখা মাসিকপত্রে পাড়ার মধ্যে আবদ্ধ রইবে?"

পণ্ডিত বল্লেন, "একটা প্রেস কেনা যাক্। পাঁজিতে দেখেছি বাংলা পকেট প্রেস পাওয়া যায়।"

ইতিমধ্যে ম্যাজিক লণ্ঠন ভি-পি-তে আনিয়ে চঞ্চল ভালো রকম পিটুনি খেয়েছে। পকেট প্রেসের কথা শুনলে বাবার পকেট থেকে কিল চড় বেরিয়ে আসবে।

চঞ্চল বলল, "না, না। পকেট প্রেস নয়। ছাপাখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হবে। আমাদের মাসিকপত্র অন্যান্য মাসিকপত্রের থেকে কোন অংশে হীন?"

ভারত বলল, "আমি প্রস্তাব সমর্থন করি।" ছাপাখানাকে কত টাকা দিলে এমন একটি মাসিকপত্রের কয় কপি ছাপবে এবং সে টাকা কোথা থেকে আসবে, এ সম্বন্ধে আলোচনা চলল।

চঞ্চল বলল, "এক কাজ করলে কেমন হয়? বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক্, যাঁরা অগ্রিম দু'টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁদের কাছ থেকে পুরো তিন টাকা নেওয়া হবে না। নিশ্চয়ই দু'তিন হাজার গ্রাহক জুটে যাবে দেখতে দেখতে। সেই টাকায় আমরা কাগজ ছেপে বার করব।"

সকলে বলল, সাধু সাধু সাবাস হিপ্ হিপ্ হুরে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

মাসিকপত্র লিখে চঞ্চল দুটি বছর পড়াশুনায় অমনোযোগী হলো। কোনমতে ক্লাসে উঠল বটে, কিন্তু অপরে হলো তার কর্ণধার। ওদিকে তার বন্ধু রতনলাল একজন প্রচণ্ড বক্তা হয়ে উঠছে। সে যখন বক্তৃতা দিতে ওঠে তখন থেকে তালি পড়তে

আরম্ভ হয়। সে যখন সম্বোধন করে বলে, "Friends, Pratapgarhins Countrymen" তখন কারুর হাত চুপ মানে না। জীবে দয়া, নগর ভালো না গ্রাম ভালো, মাস্টার হবো না হাকিম হবো—ইত্যাদি সামান্য বিষয়েও রতনলাল টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করে ছাদ ফাটিয়ে সিংহনাদ ছাড়ে। বক্তৃতা যখন শেষ হয় রতন বলে, "I pause for a reply."

রতনকে বাগ্মিতায় হারাতে না পেরে হোস্টেলের ছেলেরা চক্রান্ত করে স্কুলের সমিতির সহকারী সম্পাদক করল না। রতন যোগাড়ে ছেলে। সবাইকে বোঝালো, যারা হোস্টেলে থাকে না, তাদের আত্মসম্মান বজায় রাখতে হলে স্কুলের সমিতিকে বয়কট করে স্বতন্ত্র সমিতি স্থাপন করতে হয়।

হোস্টেলের বাইরের ছেলেরা ক্ষেপল। স্কুলের সমিতি বয়কট করে রতনদের পাড়ায় সভা করল। সভায় সাব্যস্ত হলো, নতুন একটা সমিতি স্থাপিত হোক, তার সম্পাদক হোক শ্রীযুক্ত রতন আর—সর্ব্বসম্মতিক্রমে—সহসম্পাদক হোক শ্রীমান চঞ্চল।

চঞ্চল তো অবাক। সে একজন অতি নিঃশব্দ বক্তা, বলতে দাঁড়ালে "সভাপতি মহাশয়" বলেই চোখে সর্ষেফুল দেখে। "আমার আর বিশেষ কিছু বলবার নেই" বলে বসে পড়ে। সবাই মিলে তাকে রতনের সহকারী করে দিয়ে সম্মান দেখাল, না অপমান করল ?

ঠিক হয়ে গেল নতুন সমিতিতে নানা রকম মাসিকপত্র নেওয়া হবে। চাঁদা উঠল। মাসিকপত্রের অফিসে চিঠি গেল। ভি-পি এলো। চঞ্চলের উপর ভার পড়ল সভ্যগণকে মাসিকপত্র ইসু করবার ও তাদের পড়া হয়ে গেলে ফেরত নেবার। এই উপলক্ষে চঞ্চল মাসিকপত্র নাড়াচাড়া করল রোজ। সুনন্দা দেবীরা চলে যাবার পর দু'বছর কেটে গেছে। চঞ্চলের বুদ্ধি বেড়েছে। এখন সে তাম্রশাসন ও শিলালিপির অর্থ আন্দাজ করতে পারে। সনেট দেখে ভয় পায় না। পুরবৈয়াঁ নামটি যেমন হোক, গল্পটি মধুর। চঞ্চল অমন গল্প খুঁজে পড়ে। প্রকৃত সাহিত্য যে কী জিনিস তা সে যেন একটু বুঝতে পারে।

চঞ্চল যখন ফোর্থ ক্লাসে উঠল তখন রতনের সমিতি ভেঙে গেল। রতন হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলল। চঞ্চলও দেখল যে পুরোনো সমিতিতে হেডমাস্টার মশাই নিজের নেওয়া অসংখ্য মাসিকপত্র দান করে তার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছেন। আপোসে স্থির হলো যে, নামে সহকারী সম্পাদক না হলেও কার্যত চঞ্চল মাসিকপত্র নাড়াচাড়া করবে। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, সবুজ পত্র, মানসী ও মর্মবাণী, গৃহস্থ—ওঃ, আরো কত মাসিক যে চঞ্চলকে প্রতিদিন প্রলুব্ধ করল ! সে কেবল ভাবে কখন টিফিনের ঘণ্টা পড়বে, কখন পড়ে-ওঠা মাসিকগুলি ফেরত দিয়ে না-পড়া মাসিক বাড়ী নিতে পাবে ! ঠিক সেই সময়টাতে বাংলা মাসিকপত্রে বিশ্বভাবের বন্যা এসেছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পিঠ-পিঠ। ভারতী এসেছে মণিলাল ও সৌরেন্দ্রমোহনের

হাতে। ফরাসী ও রাশিয়ান গল্পের তর্জমা চলেছে। সবুজ পত্রে প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল মজলিশ জমিয়ে রেখেছেন। গৃহস্থে বিনয়কুমার সরকার পাঠকের চিত্তকে সাথী করে পৃথিবী পরিক্রমা করছেন।

চঞ্চল বিহ্বল হয়ে পড়ে। পড়ে বিহ্বল হয়।

চঞ্চল ছিল গোড়া থেকে খুব গোঁড়া। ঠাকুরমার সঙ্গে কার্তিক মাসে রাত থাকতে স্নান করতে যেত। শীতের পরোয়া রাখত না। একাদশীতে উপবাস করতে যেত, বাধা পেলে বিরক্ত হতো। তখন তার জন্য একটা নতুন বিধান আনাতে হতো—সে উপবাসও করবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফলারও করবে। দুর্গোৎসবে ও সরস্বতী পূজায় সে যত্ন করে ফুল তুলে আনত। ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিত। কালীপূজায় সে দীপালি জ্বালত, শিবরাত্রিতে সে রাত জাগত। দোলের জন্য বাঁশের পিচকারী পনেরো দিন আগে থেকে বানিয়ে রাখত। রজসংক্রান্তিতে বাঁশের দোলা খাটিয়ে আমগাছে দুলত। গোব্রাহ্মণে ছিল তার সমান শ্রদ্ধা, গঙ্গাজল মাথায় ছিটিয়ে তার ভারি পবিত্র বোধ হতো। ঠাকুরের প্রসাদী ফুল পকেটে নিয়ে পরীক্ষা দিতে যেতো, রাস্তার ভুলদিকে পাখী বসেছে দেখলে তাকে উড়িয়ে অন্য দিকে বসিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হতো। চোখের পাতা ভুলভাবে কাঁপলে সে ভেবে আকুল হতো। মুখে মুখে অনেক শ্লোক শিখেছিল, মনে মনে আওড়াতো।

মোট কথা, সে ছিল অতিমাত্রায় নৈষ্ঠিক। তার নিষ্ঠা আন্তরিক না কৃত্রিম সে বিষয়ে তাকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। খুব সূক্ষ্ম চামড়ার উপরে পরিষ্কার বাতাসা রেখে সবাইকে খেতে দেওয়া হলো, খেলে কিছু দক্ষিণারও আশা ছিল, চঞ্চল কিছুতেই খেল না। অন্য সকলে—পণ্ডিত দাদাও—নির্বিকার ভাবে খেলো। কোথায় সবাই চঞ্চলকে প্রশংসা করবে, না, যে শুনল সেই বলল ছেলেটা বোকা!

তা হোক, ভিন্ন ধর্মের লোকের সম্বন্ধে চঞ্চলের ছিল সত্যিকার কৌতূহল। এক মুসলমান মাস্টার ছিলেন, তিনি বড় ভালোমানুষ, চঞ্চলদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়ী গেলে তাঁর স্ত্রী মুরগীর ডিম সিদ্ধ করে খাওয়াতেন। খোলা ভাঙতেই যখন মার্বেলের মতো সাদা জিনিসটি দেখা দিত আর সাদার পর্দা তুলতে যখন কদম্ব কোরকের মতো হলদে জিনিসটি বেরিয়ে আসত তখন চঞ্চলের মনে থাকত না যে মুরগীর সঙ্গে এটার কোনো সম্বন্ধ আছে। তার পর কেউ যদি বলে, এই বুঝি তোমার পুণ্য করা? তখন চঞ্চল ভারি অপ্রস্তুত হতো। তাই তো, পরকালে তার কী দশা হবে!

আর একজন মুসলমান ছিলেন, তাঁর নাম বোখারী সাহেব। তাঁর পূর্বপুরুষের দেশ বোধ হয় বোখারা সমরকন্দ। তিনি আনতেন পীরের সিন্নী, কিছু চাঁদা নিয়ে যেতেন। সিন্নীতে আমিষ না থাকায় পরকালের ক্ষতি করত না।

আর আতাহার মিঞা পাঠাতেন হালুয়া। সে অতি স্বর্গীয় সামগ্রী। অন্যান্য মুসলমানেরা কেউ দিতেন পেস্তা বাদাম আখ্‌রোট, কেউ দিতেন মেওয়া ফল। প্রতিবেশী

মুসলমান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার ভাব ছিল। একজন তাকে ঘুড়ি বানিয়ে দিত, নানা রঙের ঘুড়ি। একজন তাকে বাগানের ফুলটা ফলটা দিত। ওরা যে মুসলমান বলে অন্যজাতের, হিন্দুর থেকে আলাদা একথা মনে আসত না।

চঞ্চল যে হিন্দু বা কোনো জাতের লোক যে হিন্দু, তাই চঞ্চল জানত না। হিন্দু কাকে বলে তাই আবিষ্কার করতে চঞ্চলের অনেক বয়স লাগল, ততদিনে সে মহাযুদ্ধের খবর রাখতে শিখেছে। হিন্দু এই শব্দটাতে কেমন একটা ম্লেচ্ছ গন্ধ পেয়ে চঞ্চলের তার উপর অশ্রদ্ধা হয়েছিল।

মুসলমানদের সঙ্গে চঞ্চলদের যেমন আদান-প্রদান ছিল, খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তেমন নয়। তারা যেন একটু দূরে থাকতে ভালোবাসত। যদিও প্রতিবেশী। কেবল পোস্টমাস্টারের সঙ্গে হতো হাসি-তামাসা। তাঁর মনে স্বাতন্ত্র্যের অভিমান ছিল না। আর সেই য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেব মাঝে মাঝে এসে হাতে-পায়ে মোচড় দিয়ে ভয় দেখিয়ে ম্যাজিক দেখিয়ে কৌতুক করে যেতো। তার বাড়ীতে গেলে পাওয়া যেতো বিজাতীয় কেক। কেককে চঞ্চল পরকালের পরম শত্রু বলে গণ্য করত।

সর্বনাশ! কেক খেলে কি আর স্বর্গে জায়গা হবে? ওতে যে কী মেশানো রয়েছে কে জানে? মদ—ভয়ঙ্কর জিনিস! মদ আছে ওতে! সাহেবরা যে মদ খায়, এই একটি দোষে ওরা চঞ্চলের ঘৃণার পাত্র হয়েছে।

বাবার ব্রাহ্ম বন্ধুর ওখানে গেলেও কেক খেতে পাওয়া যায়। তার উপর তিনি যে ঠাকুর দেবতা মানেন না এমন কথাও চঞ্চল শুনেছিল। "একবার ভেবে দেখ, জগন্নাথ বলরাম মদনমোহন চন্দ্রশেখর এঁরা সব মিথ্যা।" কী সর্বনাশ! এঁরা যে বিষম রাগ করে না-জানি কী মহাক্ষতি করবেন! কুষ্ঠ রোগ পাঠাবেন কি ওলাউঠায় ওপারে টেনে নেবেন!

কথাটা কিন্তু চঞ্চলের মন থেকে গেল না। বছরে বছরে তার বয়স বাড়ে, জ্ঞান বাড়ে, ভাবনা বাড়ে। ধীরে ধীরে কেমন করে তার ধারণা হলো যে ভগবান নিরাকার, তাঁর কোনোরকম মূর্তি থাকতে পারে না, মূর্তিকে প্রণাম করা ভোগ দেওয়া নৌকায় চড়িয়ে হাওয়া খাওয়ানো রথে চড়িয়ে হন হন করে টানা—এসব ছেলেখেলা।

চঞ্চলের আর এসব কাজে তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। তবে সকলের সঙ্গে সেও জুটে যায়, হৈ হৈ করে, ফুল তুলে আনে, পুষ্পাঞ্জলি দেয়, প্রসাদ খায়। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না, তার বিশ্বাস অন্তর্হিত হয়েছে। তার নিষ্ঠার কমতি লক্ষ্য করে কেউ কেউ হাসলেও ওটাকে একটা দুর্ঘটনা বলে ভয় করে না। উঠ্‌তি বয়সের ছেলেরা উপবাস করবে সেই এক অনাসৃষ্টি। এটা খাবে না ওটা ছোঁবে না, সেই এক অকালপক্কতা।

গোঁড়ামি যখন চলে গেল তখন চঞ্চল সবদিক থেকে মুক্ত বোধ করল। সে ধ্যান করল বিশাল পৃথিবীর। তার ইচ্ছা করল দেশে দেশে বেড়াতে, নতুন নতুন বিষয়ে

শিখতে, নানা রকমের কৃতী হতে। কত ছেলে জাহাজে কাজ নিয়ে বিদেশ চলে গেছে, সেখানে বাসন মেজেছে, কাপড় কেচেছে, বাড়ী চুনকাম করেছে, ড্রেন সাফ করেছে। ক্রমে ক্রমে মানুষ হয়েছে, উন্নতি করেছে। বিদেশী ছেলেদের গল্প পড়ে চঞ্চল ভাবে, আমিও তো মানুষের ছেলে। ওরা যা করতে পেরেছে, যা হতে পেরেছে, আমিও কেন তা পারব না?

তার মধ্যে এই উতলা ভাব দিন দিন বাড়তে থাকল। তার দেহ থাকে এক স্থানে, তার মন বেড়ায় বিশ্বময়। কখনো জাপানে, কখনো আমেরিকায়, কখনো কোনো অধিবাসীহীন দ্বীপে যেখানে সে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারে।

এমন সময় আমেরিকা থেকে ফিরলেন তার সহপাঠী বন্ধুর আত্মীয়। তিনি যে পথ দিয়ে মোটরে করে যাবেন চঞ্চলরা সেই পথের একধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মোটর যখন এল তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। ভালো করে দর্শন করতে হবে সেই বীরকে, self-made manকে। মোটর এত জোরে ছুটে গেল যে কোনটি যে তিনি চঞ্চলরা তা অনুমান করতে পারলে না। মোটরের পিছু পিছু দৌড়িয়ে তারা যখন তাঁর দাদার বৈঠকখানায় পৌঁছল সেখানে তখন বিরাট ভিড়। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা দিতে দিতে তারা এগিয়ে গিয়ে দেখলে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা একটি সহজ মানুষ। পনেরো বছর পরে ফিরেছেন বলে ভাঙা ভাঙা ভাষায় কথা বলছেন। জিজ্ঞাসা করছেন, ও কেমন আছে, সে কোথায়, ঐ সব বাড়ী কবে তৈরী হোল, একে তো আমি চিনতে পারছি নে, ওঃ তুমিই সেই, এরি মধ্যে এত বড় হয়েছ!

পনেরো বছরে কত মানুষ মরে গেছে, কত যুবক বুড়ো হয়েছে। কত শিশু যুবক হয়েছে, কত গাছ কাটা হয়েছে, কত বাড়ী ভেঙে গেছে, কত বাড়ী পুড়ে গেছে, কত বাড়ী গড়া হয়েছে।

চঞ্চলরা তাঁকে নির্নিমেষ নয়নে দেখতে লাগল। তাঁর উপর তাঁর পনেরো বছরের বিদেশী ছাপ কি ভাবে পড়েছে। তাঁর আকৃতিতে উজ্জ্বলতা, তাঁর আচরণে আত্মবিশ্বাস, তাঁর পরিচ্ছদে মার্জিত রুচি। তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে চঞ্চলদের যে আগ্রহ তা ব্যক্ত করলে রতনলাল। বলল, "আপনি একটি বক্তৃতা দিলে আমরা সকলে কৃতার্থ হবো।"

তিনি স্বীকার করলেন। সময় ও স্থান স্থির হলো। চঞ্চল একটা গান লিখে ফেল্লে। একজন তাতে সুর দিলেন। গানের পর হলো বক্তৃতা। সকলের অনুরোধে তিনি ইংরাজীতে বল্লেন। সে ইংরাজীর উচ্চারণ একেবারে বিদেশী। তবু বোঝা গেল তিনি নিজের ভাগ্যের পাশা নিজের হাতে খেলেছেন। সম্প্রতি দেশেও সেই খেলা খেলবেন। সামনে তাঁর ভাগ্যপরীক্ষা। কারখানা খুলবেন।

একটু আড়ালে পেয়ে চঞ্চল ও রতন তাঁকে জাহাজ চড়া, কাঁটা চামচ ধরে খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করল। তিনি হেসে বল্লেন, চোখ-কান খোলা রাখলে ওসব

শিখতে কতক্ষণ লাগে ?

অর্থাৎ একবার বেরিয়ে পড়তে পারলেই হয়। আগে থেকে অত ভেবে ফল নেই। চঞ্চল ভাবল কী করে বেরিয়ে পড়বে। ভাবল, কিন্তু ভাবনার শেষ পেল না।

তার জল্পনাকল্পনার ইসারা পেয়ে রতনলাল রটিয়ে দিল যে চঞ্চল যাচ্ছে আমেরিকা। চঞ্চলের মা সে গুজব বিশ্বাস করে ভয় পেয়ে গেলেন। বাবা অথচ হেসে উড়িয়ে দিলেন। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করল, কবে যাচ্ছ, টাকা কোথায় পেলে, বিনা টাকায় যদি হয় তবে আমাদেরকেও নিয়ে চলো।

চঞ্চল ভাবে আর বই কাগজ পড়ে, আর নানা অপরিচিত কোম্পানীকে চিঠি লিখে জানতে চায় জাহাজে কাজ খালি আছে কিনা। হয়তো উত্তর আসেই না। নয়ত আসে...না।
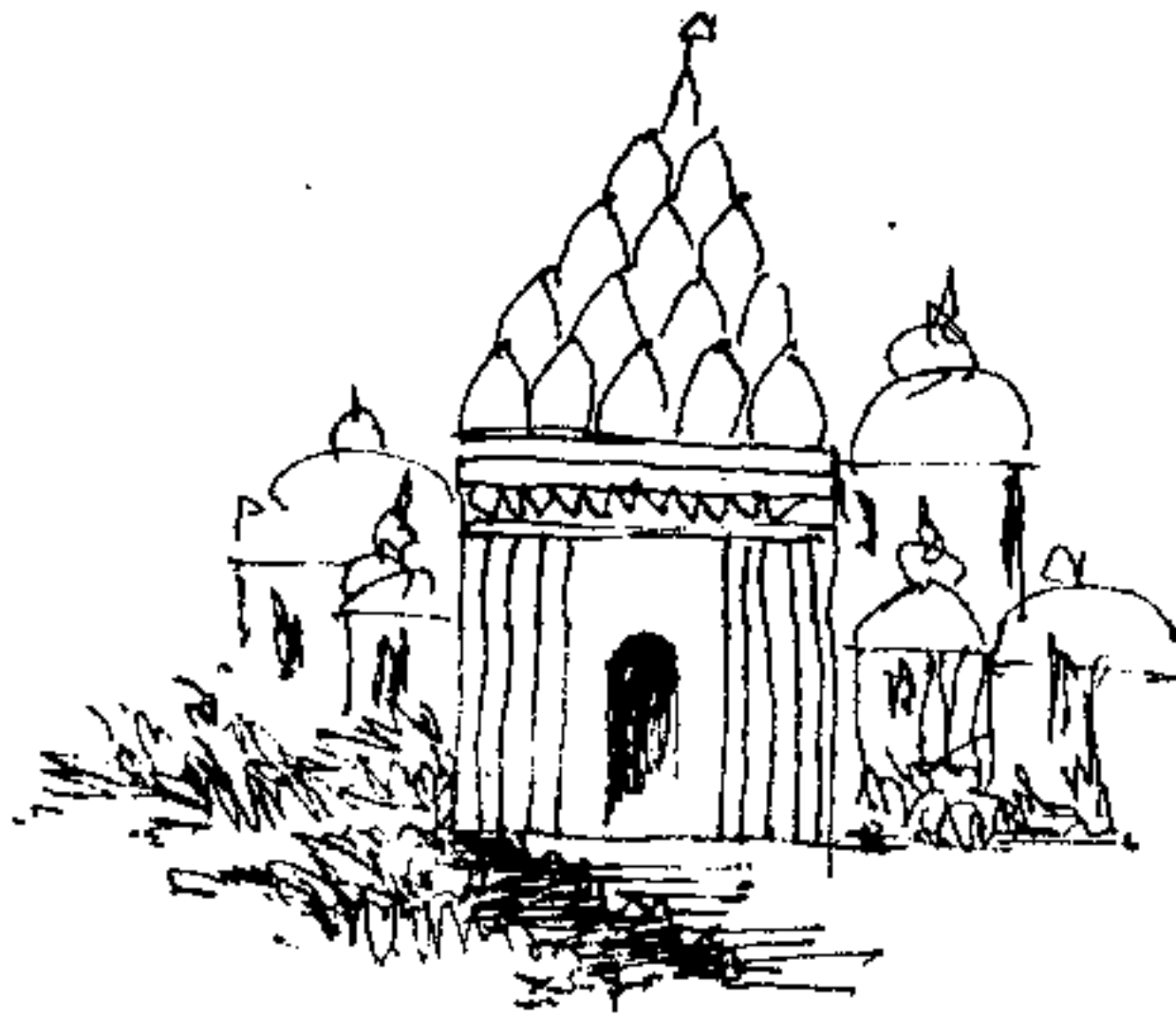
আইল অফ্ ওয়াইট

ইংলণ্ডের দক্ষিণে এই যে দ্বীপটি এটি আমাদের যে কোনো মহকুমার চেয়েও বোধ হয় ছোট; কিন্তু তোমাদের ক'জনই বা নিজের নিজের মহকুমা বা জেলা মোটামুটি রকম দেখেছ? এরা কিন্তু এরোপ্লেনেও যেমন ওড়ে পায়েও তেমনি হাঁটে। আমি এই চিঠি লিখছি আর আমার কাছে একটি ছোকরা বসে আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়ছে; সে লণ্ডন থেকে ব্রাইটন ২৫ মাইল ৮ ঘণ্টায় হেঁটে এসেছে, সে রাস্তাও আমাদের রাস্তার মতো সমতল নয়, পাহাড়ে। ব্রাইটন থেকে এখানে জাহাজে করে আসা যায়, কিংবা রেলে করে পোর্টস্‌মাথে এসে সেখানে থেকে জাহাজে করে এখানে আসা যায়। আমি লণ্ডন থেকে পোর্টস্‌মাথ রেলে এলুম, তারপর জাহাজে চড়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে এখানে পৌঁছলুম। এই দ্বীপটার আগাগোড়া রেল আছে, বাস আছে, জাহাজ আছে, ট্যাক্সি আছে, ঘোড়ার গাড়ী আছে, পায়ে হেঁটে সমস্ত দ্বীপটা দেখতেও বেশী সময় লাগে না। দ্বীপটাতে গোটা পাঁচ-ছয় শহর আছে, সেখানে গ্রীষ্মকালে লোকে হাওয়া বদল করতে আসে। খুব ছোট ছোট শহর, কিন্তু চমৎকার পরিপাটি। রাস্তঘাট ফিটকাট, বাড়ীঘর সারিবদ্ধ, দোকানে বাজারে ইংরেজসুলভ শৃঙ্খলা, কোনো রকম হট্টগোল, কোনো রকম দরকষাকষি, কোনো রকম ফেলাছড়া নেই।

মেজের ওপরে হাঁটু গেড়ে ইংরেজ মেয়ে মেজে-দেয়াল নিকিয়ে চক্‌চকে করছে, এমন দৃশ্য প্রতিদিন সকালবেলা দেখি। ঘর-সাজানো জিনিসটি ইংরেজরা যেমন বোঝে আমরা তেমন বুঝিনে। প্রত্যেকটি আসবারের নির্দিষ্ট স্থান আছে, একস্থানে কিছুই জড় করা হয় না, নির্দিষ্ট স্থান থেকে কোনো জিনিস এক ইঞ্চি সরে না। যেমন ঘরে তেমনি বাইরে। আমাদের ভালো ছেলেরা আঙুলে কালি মেখে চুল ঝোড়োকাকের মতো করে জামার আস্তিন খোলা রেখে চটি ফটফট করতে করতে হাঁটেন, অথচ তাঁদের মা-বোনদের এদিকে নজর দেবার ফুরসৎ থাকে না এবং তাঁদের বাপ-খুড়োদের মতে এই তো সুবোধ ছেলের লক্ষণ। ছেলে আমার লেখাপড়া ছাড়া আর কিছুতে মন দেয় না, এ কি কম সৌভাগ্য?

ইংরেজ ছেলেদের মায়েরা কিন্তু অতি অল্প বয়স থেকে ছেলেকে ফিটফাট হতে শেখান, সেই জন্যে হাত-মুখ ধুয়ে মুছে মেজে ধবধবে তকতকে রাখাটা ভালো ছেলের পক্ষে লজ্জার কথা নয়, চুলে চিরুনি দিয়ে ব্রাশ লাগিয়ে ভদ্রগোছের একটা অতি সাদাসিধে টেড়ী কাটা স্বয়ং পণ্ডিত মশাইয়েরও নিত্যকর্মের অঙ্গ এবং খুব অল্পদামের পোশাকও নিজের হাতে ঝেড়ে কেচে পরিষ্কার রাখা সম্ভব।

এই বাড়ীতে একটি ছোট ছেলে তার বাবার সঙ্গে এসেছে; তার বাবার সঙ্গে তার যে রকম সম্বন্ধ তাকে আমরা বলতুম—"দোস্তি"। এরা যেন দু'টি বন্ধু ইয়ার,

পরস্পরের সঙ্গে ঠাট্টা করতে এদের একটুও বাধে না, পরস্পরের সঙ্গে খেলা করা তো তবু ভালো, পরস্পরের সঙ্গে বক্সিং লড়াটাও মাঝে মাঝে চলে! বাপ ছেলেকে "Wild Flowers" নামক একখানা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার বই উপহার দিয়ে তার ওপরে লিখেছেন "To Roy—Dad"।

ছেলেটির নাম Roy— আমি এই চিঠি লিখছি, Roy পিয়ানো বাজাচ্ছে, তার বাবা এলেন। Roy বললে, "বাবা, তোমাকে কত খুঁজলুম, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

বাবা বললেন, "বাগানে ছিলুম।"

ছেলে বাবার কাছে গিয়ে আনন্দে লাফ দিলে যেমন পোষা কুকুরে লাফায়, তারপর আবার গিয়ে পিয়ানোয় বসল, তার বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন। তার বাবা তাকে কোনো বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেন না। তার দস্যিপনায় তিনি তার সর্বপ্রধান সাথী, দুরন্তপনায় তিনিই তার ওস্তাদ।

সেদিন সকালবেলা আমি ব্রেক্‌ফাস্ট খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি, এমন সময় পেছন ফিরে দেখি একখানা ঘোড়ায়-টানা cart আসছে, আমাদের দেশের মোষে-টানা গাড়ীর মতো মাল-বোঝাই। গাড়ীটা আমার কাছে এসে থামল। গাড়ীর চালক আমাকে বললে, "গাড়ীতে বস্‌বেন?"

আমি বললুম, "বেশ তো।"

তখন তার পাশে গিয়ে বসলুম। সে বললে, "কোথায় যাওয়া হচ্ছিল? Sandown!"

আমি বললুম, "কোথায় যাবো ঠিক না করে বেরিয়েছি—পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।"

সে বললে, "আসুন তবে, Sandown ঘুরে আসবেন, বেশি দূর না, লাঞ্চের আগেই ফিরতে পারবেন।"

তারপরে যা ঘটল তার বিবরণ দিতে বসলে একখানা মহাভারত লেখা হয়ে যায়। সুতরাং সংক্ষেপে সারি। সে দিন বাসায় ফিরে লাঞ্চ খাওয়া তো ঘটলই না, বাসায় ফিরে চা খাওয়াও ঘটল না, এবং ডিনারের জন্যে ফিরতে দিতেও তার ইচ্ছা ছিল না। সে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে লাঞ্চের সময় lobster খাওয়ালে, তার এক বন্ধুর বাড়ীতে চায়ের সময় কাঁকড়া খাওয়ালে এবং সারাদিন ধরে গাড়ীতে করে অনেক গ্রাম ও শহর তো দেখালেই, শেষকালে বাসায় এনে পৌঁছে দিলে। লোকটা হচ্ছে তার নিজের কথায় "fisherman by trade", তার বয়স ৬৬ বৎসর, গায়ে ভীমের মত জোর, বক্সিংএ নাকি এ দ্বীপে তার দোসর নেই। যুদ্ধের সময় submarine-এর ওপর নজর রাখবার জন্যে যে সব জাহাজ ছিল তাদের একটাতে সে কাজ করত। এই দ্বীপেই তার জন্ম, এইখানেই সে অধিকাংশ জীবন কাটিয়েছে

এবং এখনো তার ইচ্ছা আছে নানা দেশ ঘুরে আসবে, India দেখে আসবে। সে জিজ্ঞাসা করলে, "India কত বড়? লণ্ডনের চেয়েও বড়?" তার জিওগ্রাফীর দৌড় লণ্ডন অবধি!

তার সঙ্গে Sandown গেলুম। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হয় সেই সেলাম করে। পাড়াগাঁয়ের লোক নতুন লোক দেখলেই শ্রদ্ধা জানায়। সুইটজারল্যাণ্ডের চাষারা রাস্তায় সেলাম করে বলেছে, "Bon jour, monsieur." এখানকার গেঁয়ো লোকেরাও দেখা হলেই বলে, "Good Morning, Sir!"

লণ্ডনের মতো শহর জায়গায় নতুন লোকের সম্মান নেই, কারণ সেখানে তো নতুন লোকের ছড়াছড়ি। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হয় টেরি তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়, জুড়ে দিয়ে শেষকালে বলে—"এই ছেলেটি এ অঞ্চলে নতুন এসেছে, একে দেশ দেখাতে নিয়ে চলেছি।" টেরির ইচ্ছাটা এই যে আমি যেন জানি, টেরি এ দ্বীপের একটা মাতব্বর লোক, সকলে তাকে চেনে ও ভালোবাসে। "They all like me—don't they?" কথায় কথায় আমার ওপরে এই প্রশ্নবাণ। "They all know me—I am known all over the Island—am I not?"

আমি অগত্যা বলি, "তা তো দেখছি।"

তখন সে বলে, "When you go back to India, tell your father that you met Terry Kemp, the fisherman."

সে বেচারা জানে না সে India এখান থেকে আট হাজার মাইল দূরে, সে ভাবছে India বোধ হয় ফ্রান্সের মতো কাছাকাছি।

টেরির সঙ্গে সেদিন সমস্ত দিন বকেছি, কিন্তু ঐ একই কথা। "Isno't that a good pony?" আমি বলি, ""Certainly", "Isn't that a lovely dog?"

"Oh, yes."

মোট কথা, টেরির যা কিছু সমস্ত ভালো। তার ঘোড়ার মতো ঘোড়া এ দ্বীপে নেই, তার কুকুরের মতো কুকুর এ দ্বীপে নেই। তার বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেখালে তার মোটর বোট্,তার ছোট ছোট নৌকা, তার ভাড়া দেবার চেয়ার, তার মুরগীর পাল—তার সমস্ত কিছু নতুন লোকের দেখ্‌বার মতো এবং বাবাকে লেখবার মতো। "Well, you like it. Then write that to your father."

আমার বাবার প্রতি তার এই আকর্ষণটা বড়ই অযাচিত। আমার বাবার বয়স কত, তাঁর ক'টি ছেলেমেয়ে, তিনি কবে ইংলণ্ডে আসবেন, ইত্যাদি ঘরোয়া প্রশ্নের কথা তোমাদের নাই জানালুম। তোমরা শুধু জেনো, পাড়াগাঁয়ের লোক সব দেশেই সমান, সব দেশেই এদের স্নেহ-মমতা বেশী, অতি সহজে এরা মানুষকে আপন করে নেয়, বিদেশী লোককে সাহায্য করতে পারলে এরা কৃতার্থ হয়ে যায়। তবে গ্রামের মধ্যে এরাই যে মাতব্বর লোক, এদের যা আছে আর কারো যে তা নেই, এ কথাটা

এরা পদে পদে জানিয়ে রাখে এবং কেবল তুমি জানলে হবে না, তোমার বংশসুদ্ধকে জানিয়ে দেওয়া চাই।

টেরির বাড়ী হয়ে Shanklin দেখতে এলুম। Shanklin বড় সুন্দর শহর। পাহাড় কেটে সমুদ্রের বাঁধ করা হয়েছে, যেন দেয়ালের মতো সোজা হয়ে উঠেছে। অনেক উঁচুতে বাঁধের ওপরে বড় বড় সব হোটেল, কাফে, সিনেমা, নাচঘর। টেরি ওখান থেকে গাড়ী বোঝাই করে কাঁকড়া ও lobster সংগ্রহ করলে, ও সব সিদ্ধ করে অন্যত্র বিক্রি করে মুনাফা পাবে। Shankli থেকে ফেরবার সময় দৈবাৎ তিনটি ভারতীয় তরুণীর সঙ্গে দেখা। ভদ্রতার ধার না ধেরে টেরি করলে কিনা, আমার মত না নিয়ে তাঁদের ডেকে বললে, "Ladies, here is a gentleman wishing to meet you." আমি অগত্যা নেমে পড়ে তাঁদের সঙ্গে দু-একটা শিষ্ট কথা বিনিময় করলুম।

টেরির জ্বালায় শেষটা আমার দশা এমন হয়েছিল যে, মনে মনে বলতে লাগলুম, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। রাজ্যিসুদ্ধ সকলের সঙ্গে তার ভাব, সকলের সঙ্গে তার ঠাট্টা। এক তরুণ তার তরুণীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে ফিরছে—টেরি তাকে বললে, "কি হে, তুমি তোমার মেরীকে নিয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি! আমাদেরও দিনকাল ছিল হে, আমাদেরও মেরী ছিল!"

বুড়োর রসিকতায় তরুণীটির মুখ এমন রাঙা হয়ে উঠল আর তরুণটির হাসি এমন সঙ্কোচসূচক হলো যে, আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম অথচ এ ধরনের রসিকতা তো এই নতুন দেখলুম না, দেশেও দেখেছি পাড়াগাঁয়। এটা তাজা মনের, সুস্থ মনের লক্ষণ। দোষের মধ্যে এটা একটু ভোঁতা, একটু স্থূল।

তারপরেও এ রকম রসিকতা পদে পদেই চলল। পথে তরুণী দেখলেই বৃদ্ধের ঠাট্টা শুরু হয়। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, "এমন girls তোমার দেশে আছে?" কী আপদ্! আমি বলি, "হুঁ।"

এর পরে টেরির বাড়ী এসে lobster সিদ্ধ করলুম তার সঙ্গে মিলে। তার মতো লোকের বাড়ীতেও কলের উনুন আছে, পয়সা ফেললেই গ্যাসের আগুন জ্বলে। ইউরোপের গরীব লোকেরাও খুব আরামে থাকে। তাদেরও স্বতন্ত্র বস্‌বার ঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘর, স্নানের ঘর—সাজসজ্জা বেশ ভালোই। তবে টেরির বাড়ীটা কিছু নোংরা ও এলোমেলো। কারণ টেরির বুড়ী মারা গেছে, ছেলে মারা গেছে। টেরি কোথায় খায়, কোথায় শোয়, তার ঠিক থাকে না। সে মাছ-কাঁকড়া ধরে ও বিক্রী করে গ্রামে গ্রামে বেড়ায়।

Lobster সিদ্ধ করতে বেশ সময় লাগে। কতগুলো জ্যান্ত lobster ডেক্‌চিতে করে উনুনে চড়িয়ে দিয়ে আমরা চা খেতে বসলুম। Lobsterগুলো সিদ্ধ হলে পর জ্যান্ত কাঁকড়া সিদ্ধ করার পালা। সে গেল ঘোড়াকে hay ঘাস খাওয়াতে, আমি রইলুম কাঁকড়ার তদ্বির করতে। কাঁকড়াও সিদ্ধ করতে সময় লাগে অনেক। কাঁকড়াগুলো

সঙ্গে নিয়ে ও লবস্টার খেয়ে আমরা বেরুলুম সেন্ট হেলেন্স গ্রামের পথে রাইডের অভিমুখে।

পথে এক কৃষকের বাড়ী থেমে দেখলুম, কৃষক কোথায় গেছে, কেউ নেই বাড়ীতে। কৃষকের অনেকগুলি মুরগী আর গোরু আছে, আর তার পুকুরে অনেকগুলি হাঁস সাঁতার কাটছে। মুরগী এ দেশে সব গ্রাম্য লোকেই রাখে, তাতে খরচ কম, লাভ অনেক। আর একজন কৃষকের বাড়ী গেলুম, সে গরীব বলে তাকে টেরি গোটাকয়েক কমলালেবু দিলে, দয়া করে নিজের ইচ্ছায়। তার ছেলেমেয়েগুলি ঘরের জানালার ওপার থেকে হাত নেড়ে আমাকে ভালোবাসা জানাতে লাগল। টেরি একটি ফুল তুলে এনে আমাকে পরিয়ে দিয়ে গাড়ী চালাতে যাচ্ছে এমন সময় একটা মোটাকার কোত্থেকে ছুটে এসে বেচারী নেলী কুকুরটিকে মাড়িয়ে দিয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে নেলী প্রাণে মরল না, কিন্তু তার মাথার এক জায়গা বিষম কেটে গেল। টেরি তো কিছুক্ষণ একেবারে থ' হয়ে রইল। বেচারার রসিকতা গেল কোথায়, কুকুরটিকে তুলে নিয়ে ঐ কৃষকের বাড়ী রেখে এসে সারাটা পথ কাঁদো-কাঁদো ভাবে বকতে লাগল, "আমার কত সাধের কুকুর, তাকে আমি ৫ পাউণ্ড দামেও বেচতে চাইনি, তাকে কিনা মাড়িয়ে গেল ঐ Bloodyমোটরকার! ইচ্ছা করলে কি থামতে পারত না? ড্রাইভার ব্যাটার কি চোখ নেই? মজা বের করে দিচ্ছি রোসো। আমি চিনেছি ঐ ড্রাইভারটা কে?"— তারপর ওর নামধাম, বংশপরিচয় দেওয়া চলল আর মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হতে লাগল, "ইচ্ছা করলেই সে থামতে পারত, না?"

আমার মনটাও বিস্বাদ হয়ে গেছিল। নেলীটা বড় নিরীহ কুকুর, বেচারা গাড়ীর আগে আগে সারাদিন ছুটেছে, চোখের সামনে কিনা তার এই দশা ঘটল! ভাবলুম, মানুষ কত সহজে বাঁধা পড়ে! যে মানুষের স্ত্রী মরেছে, ছেলে মরেছে, সে একটা কুকুরকে ছাড়তে পারে না, এত মমতা!

সমস্ত পথ টেরি মন খারাপ করে রইল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাকে একটা লবস্টার দিয়েছিলুম বাসায় নিয়ে গিয়ে সকলকে দেখিয়ে খেতে, আনতে ভুলে যাওনি তো সেটা?"

আমি বললুম, "সেটা একটি ছোট ছেলেকে দিয়ে দিয়েছি।"

"দিয়ে দিয়েছ—? তোমাকে খেতে দিলুম শখ করে, আর তুমি করলে বিতরণ! নাম করো দেখি কোন ছেলেটাকে দিয়েছ, দেখে নেবো একবার তাকে!"

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, "আহা, রাগ করছ কেন? তোমার এমন সুন্দর লবস্টার একলা আমি খেলে কি ভালো হতো, অনেকজন খেয়ে তোমার সুখ্যাতি করবে এ কি তুমি চাও না?"

কিন্তু যুক্তিটা তার মনঃপূত হলো না— গেঁয়ো যোগীকে ভিখ দিতে তার ইচ্ছা ছিল না। কিংবা সেই দিত, আমি দেবার কে? ভাবটা বুঝে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে

জিজ্ঞাসা করলুম, “হাঁ, টেরি, তুমি কোন Club -এ যাও ?” টেরি উল্‌টো বুঝলে, বল্‌লে, “কী বলছ ? আমি Crab-রাঁধতে জানি কিনা ? আচ্ছা, তোমাকে একটা crab (কাঁকড়া) dress করে খাওয়াচ্ছি, দাঁড়াও।”

তখন এক মাঝির বাড়ী আমরা থামলুম। মাঝি তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে চায়ের টেবিলে বসেছিল, আমাকে বসিয়ে চা খাওয়ালে। মাঝির সাত ছেলে দুই মেয়ে—স্ত্রী নেই। ছেলেগুলি মাঝির নিজের কাছে মাঝিগিরির এপ্রেণ্টিস্‌। তারা খাসা ছেলে, বেশভূষায় ভদ্রঘরের ছেলের মতন, লেখাপড়া জানে, খবরের কাগজ পড়ে। ছোট খুকীটি বড় লাজুক, তাকে আমি কিছুতেই কথা কওয়াতে পারলুম না। সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, তার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তবু সে লজ্জায় খাচ্ছে না। শেষে আমি তার দিকে না তাকিয়ে মাঝির সঙ্গে কথা জুড়ে দিলুম, তখন খুকী তার চা-টুকু লুকিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিলে।

এতক্ষণ টেরি বসে কাঁক্‌ড়া dress করছিল। Dress-করা কাঁকড়া এনে আমার সামনে রেখে বললে, “খাও।”

সর্বনাশ ! তার বাড়ীতে সে আমাকে পেটভরে খাইয়েছে, শুধু চা’ই খাইয়েছে পাঁচ পেয়ালা, যদিও চা আমি কদাচ খাই। এই আমার ভাগ্য যে, টেরি আমাকে কিছুতেই সিগারেট খাওয়াতে পারেনি এবং মদ সে নিজেই খায় না। আগে নাকি খেত, তারপরে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বড় বেশী সিগারেট খায়। তাকে এক বাক্স সিগারেট কিনে দিলুম। আর দেশলাই তার কিছুতেই জোটে না। রাস্তায় একে তাকে থামিয়ে তাদের দেশলাই চেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরায়। লোকটা দিব্যি দু’পয়সা রোজগার করে, তার বিশখানা আন্দাজ নৌকা আছে, শ’খানেক চেয়ার ভাড়া দেয়, কেউ নেই যে কারুর পেছনে খরচ করবে—তবু তার হাতে টাকা নেই। এমন দিন গেছে, যেদিন তার হাতে এক পেনীও ছিল না। আসল কথা, লোকটা তার যন্ত্রপাতির যত্ন নেয়, পাঁচ বারের পুরোনো নৌকাকেও নতুনের মত করে রেখেছে, তার পোনী ঘোড়াগুলোর পেছনে সে খরচ যত করে তাদের কাছ থেকে কাজ পায় না তত।

রাইড, ১৮ই চৈত্র ১৩৩৪

ছেলেমেয়েদের থিয়েটার

"Children's Theatre" নামে লণ্ডনে একটি ছোট্ট থিয়েটার আছে, কাল গিয়েছিলুম তার অভিনয় দেখতে। থিয়েটারটা লণ্ডনের Shaftesbury Avenueতে, ঐ রাস্তাটায় আরো অনেক থিয়েটার আছে, বড় বড় নামজাদা থিয়েটার। এই অঞ্চলটাকে বলা হয় London's Theatreland অর্থৎ লণ্ডন শহরের থিয়েটার পাড়া। কেবল থিয়েটার কেন, আরো অনেক রকম আমোদ-প্রমোদের আয়োজন এই অঞ্চলে আছে; বড় বড় সিনেমা, নাচঘর, আর্ট গ্যালারী, মিউজিয়াম, হোটেল, রেস্তরাঁ, সুইমিং বাথ্ সবই এর কাছাকাছি।

আমাদের "Children's Theatre"টি ঠিক Avenueর ওপরে নয়, একটি গলির ভিতরে। প্রবেশ করবামাত্র চোখে পড়ে। ঘরটি ছোট, শ'খানেকের বেশী সীট্ নেই, সব সীট্ স্টেজের সামনের মেজেতে। লণ্ডনের বড় বড় থিয়েটারগুলোতে তলে ওপরে মিলিয়ে বসবার কায়দা অনেক রকম, বসবার মঞ্চ চার-পাঁচ-তলা। তাদের বলে সার্কল্, স্টল, পিট্, ব্যালকনী, গ্যালারী ইত্যাদি। টিকিট কেনবার সময় ফার্স্ট, সেকেণ্ড বা থার্ড ক্লাস বললে টিকিট পাবে না, বলতে হবে "ড্রেস সার্কল্" বা "য়্যাম্ফিথিয়েটার স্টল্" বা এমনি কোনো কথা।

কিন্তু "Children's Theatre"-এ ওসব বালাই নেই, ওখানে গিয়ে বলতে হয় আমি এত খরচ করতে রাজি, এই দামের একখানা টিকিট দিন। তখন যিনি টিকিট বিক্রি করেন তিনি সেই দামের টিকিট না থাকলে তার চেয়ে একটু বেশী দামের টিকিট কিনতে পারো কিনা জিজ্ঞাসা করেন ও আপত্তি না থাকলে দেন। টিকিট নিয়ে যেই ভিতরে ঢুকলে অমনি তোমাকে একজন কর্মচারিণী তোমার টিকিটের গায়ে লেখা সীটে নিয়ে বসিয়ে দিলেন ও তুমি দুই পেনী দাম দিলে একখানা প্রোগ্রাম দিলেন। বলতে ভুলে গেছি, টিকিটের দাম বড়দের পক্ষে ছয় পেনী থেকে পৌনে ছয় শিলিং অবধি (অর্থাৎ পাঁচ আনা থেকে সাড়ে তিন টাকা অবধি), ছোটদের পক্ষে তার অর্ধেক।

আমার সীটে গিয়ে বসলুম। এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে দেখি বুড়োবুড়ীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, ছেলেমেয়ে আর বুড়োবুড়ী যেন দশ আনা ছয় আনা। তোমরা ভাবছ, ছোটদের থিয়েটারে বড়রা কী দেখতে যায়। বড়রা দেখতে যায় ছোটদের আনন্দ। এতগুলি ছোট ছেলেমেয়েতে মিলে যখন মৃদুকণ্ঠে কলরব করছিল, বার বার উঠছিল বসছিল, নিজের সীট্ ছেড়ে পরের সীটে যাচ্ছিল, ও শেষের সারিতে যারা ছিল তারা সীটের ওপর দাঁড়িয়ে দেখছিল —তখন তাদের সেই উন্মনা চঞ্চল ভাব বড়দের কত আনন্দ দিচ্ছিল তা কি তারা জানত? মেরী যখন তার সীট ছেড়ে আগের সারির একটা

রিজার্ভ সীট দখল করে বসল, তখন পেছন থেকে তার বাবা ডাকলেন—"মেরী!"

মেরী কি শুনল? মেরীর তখন কত আগ্রহ! কিন্তু রিজার্ভ সীটে যখন এক পঞ্চাশ বছরের ঠাকুমা বসলেন তখন বেচারী মেরীকে পুনর্মূষিক হতেই হলো।

এই থিয়েটারটি যেন একটি ঘরোয়া ব্যাপার। অরকেস্ট্রা ছিল না, ছিল একটি পিয়ানো। যিনি পিয়ানোতে বসেছিলেন তিনি বাজাতে বাজাতে যখন থামেন, তখন তাঁর একটু দূরে বসে থাকা খোকাখুকুদের আদর করেন। স্টেজটিও ছোট্ট, দর্শকদের খুবই কাছে, যাঁরা অভিনয় করছিলেন তাঁরা যেন দর্শকদেরই দলের লোক, তাঁদের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধ। যাঁর বইয়ের অভিনয় হচ্ছিল তিনিও অভিনয়ে নেমেছিলেন, তাঁর নাম Margaret Carter. অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বয়স বেশী নয়, সংখ্যাও অল্প। সবসুদ্ধ নয় জন অভিনয় করেছিলেন।

এই থিয়েটারটি যাঁরা চালান তাঁরা ঠিক শখের খাতিরে চালান না, ঠিক লাভের খাতিরেও না। তাঁরা একটি বন্ধুমণ্ডলী—তাঁরা একটি সুন্দর আইডিয়া নিয়ে কাজে নেমেছেন, ছোটদের একটা বড় অভাব দূর করেছেন, একটি স্থায়ী থিয়েটারের অভাব। প্রত্যেক ইস্কুলে মাঝে মাঝে যে রকম থিয়েটার হয় তাতে ভালো অভিনয় সব সময় দেখা যায় না, তাতে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের অন্য কাজ আছে, তাঁরা অভিনয়-কার্যে সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে দিতে পারেন না। কিন্তু এই থিয়েটারটিতে যাঁরা আছেন তাঁরা সব কাজ ছেড়ে এই কাজে নিপুণ হচ্ছেন, তাঁদের কেউবা বই লেখেন, কেউবা প্রোডিউস্ করেন, কেউ সীন্ আঁকেন, কেউ আসবাব তৈরী করেন, কেউ পোশাক তৈরী করে দেন। অনুষ্ঠানটির সেক্রেটারী হচ্ছেন Margaret Carter, তিনি লেখেনও ভালো। স্কুলগুলির সঙ্গে এঁদের বন্দোবস্ত আছে, এঁরা স্কুলের ছেলেমেয়েদের দলবলকে সস্তায় থিয়েটার দেখান।

কাল কী কী অভিনয় হলো বলি এবার। প্রথমে "আল্‌ফ্রেড ও পোড়া পিঠে" নামক সেই ইতিহাসের গল্পটা। অনেক শত বছর আগে রাজা আল্‌ফ্রেড তাঁর প্রজাদের সুখদুঃখ চোখে দেখবার জন্যে ছদ্মবেশে বেড়াতে বেড়াতে এক পল্লী-গৃহিণীর গৃহে বিশ্রাম করেন। সেই গৃহের উনুনের ধারে কয়েকটি পিঠে রেখে গৃহিণীর অল্পবয়সী দাসীটি খেলা করতে বেরিয়ে যায়। অতিথির অমনোযোগবশত: পিঠেগুলি পুড়ে যায়, গন্ধ পেয়ে গৃহিণী ছুটে এসে দেখেন দাসী নেই, পিঠেগুলি পুড়ছে। অতিথিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি মেয়েটির দোষ নিজের ওপরে টেনে নিয়ে বলেন, "একটা বিশেষ কাজে আমিই মেয়েটিকে বাইরে পাঠিয়েছি। আমারি দোষ।" তখন গৃহিণী ভীষণ চটে বললেন, "তবে তার বদলে তুমিই বেত খাও।"

এই বলে যেই তাঁকে মারা অমনি রাজার অনুচর এসে পড়ে বললে, "করছ কী? ইনি যে রাজা!"

তারপর গৃহিণী জানু পেতে মাপ চাইলেন, রাজা হেসে ক্ষমা করলেন এই শর্তে

যে দাসীটিকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তাঁর একজন সভাসদের সঙ্গে তার ভালোবাসা আছে তিনি জেনেছেন, তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। দাসীটি উচ্চবংশের মেয়ে, ভাগ্যদোষে দাসী হয়েছিল।

যে মেয়েটি বালিকা দাসী সেজেছিল তার বয়স বেশী নয়, চমৎকার অভিনয় করলে। রাজা আল্‌ফ্রেডের পোশাক সেকালের মতো গাম্ভীর্যময় হয়েছিল। সবচেয়ে ভালো হয়েছিল পল্লী-গৃহিণীর গৃহিণীপনা, যেমন তাঁর গলার জোর তেমনি তাঁর গায়ের জোর, যেমনি তিনি কড়া তেমনি তিনি ব্যস্ত। অন্য সকলে অভিনয়ই করছিল, তিনি সত্যি সত্যি রায়বাঘিনীগিরি করছিলেন। একেই বলে সেরা অভিনয়!

এর পরে একটি গীতাভিনয়। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার বেকার হয়ে ঘরে বসে আছে। একটি সুন্দরী মেয়ে নাচতে নাচতে এসে বললে, "Soldier, soldier, won't you marry me?"

সৈনিক উত্তর দিলে, "তোমার মতো সুন্দরীকে বিয়ে করব, আমার জুতো নেই যে!"

মেয়েটি নাচতে নাচতে জুতো কিনতে গেল। আরেকটি সুন্দরী মেয়ে নাচতে নাচতে এসে বললে, "Soldier, soldier, won't you marry me?"

সৈনিক উত্তর দিলে, "তোমার মতো মেয়েকে বিয়ে করব, আমার কোট নেই যে!" সে মেয়েটিও নাচতে নাচতে কোট কিনতে বেরিয়ে গেল।

প্রথম মেয়েটি জুতো এনে দিয়ে বললে, "Soldier, soldier, won't you marry me?"

সৈনিক উত্তর দিলে, "আমার টুপী নেই যে!" মেয়েটি টুপী আনতে গেল। দ্বিতীয় মেয়েটি কোট এনে দিয়ে বললে, "Soldier, soldier, won't you marry me?"

সৈনিক বললে, "আমার দস্তানা নেই যে!" সে মেয়েটি দস্তানা আনতে গেল।

প্রথম মেয়েটি টুপী এনে পরিয়ে দিলে। দ্বিতীয় মেয়েটি দস্তানা এনে পরিয়ে দিলে। দু'জনেই বললে, "Soldier, soldier, won't you marry me?"

সৈনিকের এবার চেহারা ফিরে গেছে। সে লাফ দিয়ে উঠে বললে, "তোমাদের এখন কেমন করে আমি বিয়ে করি? আমার যে বৌ আছে, ছেলে আছে!"

তখন এক ধার থেকে টুপীর পরে টান, আরেক ধার থেকে দস্তানার পরে টান, এক ধার থেকে জুতোর পরে, আরেক ধার থেকে কোটের পরে। নিধিরাম হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর গিয়ে নিজের আসনটিতে বসে পড়ল, মেয়ে দু'টি চলে গেল জুতো টুপী কোট দস্তানা নিয়ে নাচতে নাচতে।

এর পরে আরেকটি গীতাভিনয়—একটি প্রাচীন ছড়াকে দৃশ্যে পরিণত করা হয়েছে। একজন সেজেছিল জ্যাকেট, আরেকজন পেটিকোট। তাদের দড়ি দিয়ে রোদে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো, কুয়োয় ফেলে দিলে, উদ্ধার করে আবার ঝুলিয়ে রাখলে।

তারপর A. A. Milne-এর লেখা একটি কবিতার মূকাভিনয়— "The knight

whose armour didn't squeak." দুই নাইটের জন্যে দু'টি কাঠের ঘোড়া দেখা গিয়েছিল স্টেজে। একটি দম-দেওয়া কলের ঘোড়া ও ঘোড়-সওয়ার স্টেজের এ-পাশ থেকে ও-পাশে দৌড় দিয়েছিল। তার পরে দু'টি Sea Chantey অর্থাৎ জাহাজের নাবিকের গান গাওয়া হোল। বলতে ভুলে গেছি, স্টেজে যখন গীতাভিনয় বা গান ইত্যাদি হতে থাকে, তখন স্টেজের নীচে পিয়ানো বাজানো হচ্ছিল।

এর পরে একটা খুব চমৎকার গীতাভিনয় হলো। বার্বারী উপকূলের জলদস্যুদের জাহাজের সঙ্গে ইংরেজদের জাহাজের লড়াই। বার্বারীদের জাহাজটা গোলা খেয়ে ডুবল ও জলদস্যুরা ডুবে মরবার সময় খুব অঙ্গভঙ্গী সহকারে ঘটা করে মরল। দর্শকরা তো প্রত্যেক অভিনয়ের শেষে ঘন ঘন করতালি দিচ্ছিলই, শেষে অনেকক্ষণ ধরে করতালি দিয়ে শেষাংশটুকু আরেকবার অভিনয় করিয়ে তবে ছাড়লে। বার্বারী জলদস্যুরা উত্তর আফ্রিকার মুর, তাদের কানে বড় বড় ring, তাদের গায়ের রঙ কালো।

এর পরে একটা "Mime play" অর্থাৎ মূকাভিনয়। তিন বোনের এক খুড়ী তাদের পড়াতে এলেন, পড়াতে পড়াতে ঢুলতে লাগলেন, এই অবসরে তাদের বাড়ীর ছোকরা সহিসের (Stable boy) সঙ্গে তারা নাচতে শুরু করে দিলে। বাগানে যেখানটায় তারা নাচছিল সেখানে একটা মূর্তি ছিল, সেই মূর্তির নাম-অনুসারে নাটকটার নাম হয়েছে "The Statue."

ঘা লেগে statueটার একাংশ ভেঙে যায়, তা দেখে নাচ তো গেল থেমে, ভয়ে সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। খুড়ীর যখন ঘুম ভাঙল, তখন তিনি দেখেন তিন ভাইঝি কাকে যেন আড়াল করছে, তিনি উঠে গিয়ে যার কাছে দাঁড়ান তারি পিছনে কে একজন লুকোয়, কিছুতেই ধরতে না পেরে তিনি আবার এসে একটু ঝিমুলেন। এই অবসরে মেয়ে তিনটি সেই ছেলেটাকে নিয়ে মূর্তির জায়গায় মূর্তির মতো ত্রিভঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে দিলে। খুড়ী চোখ চেয়ে যেই তার কাছে যান অমনি সে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়, যেই ফিরে আসেন অমনি সোজা হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে খুড়ীর কেমন যেন সন্দেহ হলো, মূর্তিটা কি জ্যান্ত ? সাহস করে তিনি যেই তার গায়ে হাত ছুঁইয়েছেন, অমনি সে শিউরে উঠে বললে, "হুঁ!" ভূতের ভয়ে খুড়ীর মূর্ছা হয় আর কি!

এদের সকলেরই অভিনয় এমন হয়েছিল যে কথা না বলেও এঁরা অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যের দ্বারা গল্পটির কিছুই বোঝাতে বাকী রাখেননি। এঁদের পোশাক গত শতাব্দীর ধরনের—বেশ ঢিলেঢালা। নাচটাও হয়েছিল সেকালের মতো আয়েসপূর্ণ, একালের মতো তাড়াহুড়াময় নয়। নাচের বাজনা (পিয়ানো) নামজাদা সঙ্গীতকারদের সুরে বাজছিল—Brahms, Debussy, Chopin, Tchaikovsky. আজকালকার jazz band-এর মতো নয়। ছোটবেলা থেকে উঁচুদরের সঙ্গীতের সঙ্গে ও নাচের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে এঁরা শিশুদের রুচিকে ভালো দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন।

সবশেষে সবচেয়ে সফল অভিনয় Margaret Carter-এর নাটিকা "The Dutch

Doll'' অর্থাৎ ''হল্যাণ্ড দেশের পুতুল''। সীন্‌ উঠতেই দেখা গেল একটা বুড়ো হ্যাঁ—চ্‌—চো করে হাঁচ্‌ল। তার বুড়ী এসে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, ''এখন থেকে তিন বেলা খেতে দিতে পারব না, দু'বেলা খেতে হবে, আমরা বড় গরীব হয়ে পড়েছি।''

তাদের মেয়ে তাদের কাছে বিদায় নিতে এল, সে এক অভিনেত্রীর কাছে চাকরি পেয়েছে, তার আশা সেও একদিন অভিনেত্রী হয়ে উঠবে। তাকে বিদায় দেবার সময় বুড়ো বুড়ী কেঁদে ফেললে, সে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে খুশিমনে বিদায় হলো।

একটু পরে একখানা চিঠি এল, বুড়োর আত্মীয় লিখেছে, ''আমি তোমার মেয়েটিকে দেখতে যাচ্ছি, যে কোন মুহূর্তে পৌঁছতে পারি, দেখব মেয়েটি লক্ষ্মী কিনা, রাঁধতে-বাড়তে জানে কিনা, আমার ছেলের উপযুক্ত কিনা।''

বুড়ো বললে, ''সর্বনাশ, মেয়ে তো চলে গেল আর মেয়ে তো রাঁধা-বাড়ার ক—খ—গ জানে না, তার মন কেবল নাচ-গানে।''

বুড়ী বললে, ''একটা বুদ্ধি এঁটেছি। যাও, ঐ ঘর থেকে ঐ পুতুলটাকে নিয়ে এসো, ওটাকেই মেয়ে বলে চালাতে হবে। তোমার আত্মীয় তো তোমার চেয়েও বুড়ো, চোখে দেখতে পায় না ভালো, কানে শুনতে পায় না ভালো, আজকের মতো ওকে রাতের আবছায়াতে ভোলাতে পারা যাবে।''

এ কথা বলতে বলতে দরজায় ঘা পড়ল। কে এল? এল আত্মীয় নয়, তাঁর ছেলে। বুড়ো তো তাকে বসিয়ে খাতির করছে, বুড়ী লেগে গেছে পুতুলটাকে নাইয়ে ধুইয়ে কাপড় পরাতে। শেষে পুতুলটাকে এনে এক কোণে দাঁড় করানো হলো। পুতুলটা কলের পুতুল, তার পিছনে দাঁড়িয়ে দড়ি টানলে সে হাত-পা নাড়ে, ''হাঁ'' ''না'' বলে ও নাচে। ছেলে যেই তার সঙ্গে করমর্দন করতে গেছে, তার হাত ধরেছে জাপটে। যেই জিজ্ঞাসা করছে, ''কেমন আছেন?'' উত্তর দিয়েছে, ''না।''

টেবিলে খেতে বসে পুতুলটা কেবলি দুই হাত মুখে তুলছে ও নামাচ্ছে দেখে বুড়ো যেই দড়িটাকে আরেক রকম করে টেনেছে, অমনি সে দুই হাত ঘুরিয়ে লাগিয়েছে পাশের লোককে দুই চড়। চড় খেয়ে ছেলে গেল ক্ষেপে।

বুড়ো দেখলে ব্যাপার ভালো নয়, দড়িতে টান দিতেই পুতুল লাগল নাচতে, ছেলেটা দেখে এত খুশি হলো যে তখুনি বলে ফেললে, ''আমি একে বিয়ে করবই।''

বুড়ী পুতুলটাকে ঘুম পাড়াতে নিয়ে যাবার সময় ছেলেটা বিয়েপাগ্‌লার মতো ছুটতে চায় তার সঙ্গে, বুড়ো তাকে অনেক কষ্টে সে রাত্রের মতো বিদায় করে পরদিন আসতে বললে। কিন্তু রাত না পোহাতেই সে এসে দ্বারে দিয়েছে ধাক্কা।

ইত্যবসরে বুড়োর মেয়ে ফিরে এসেছে নিরাশ হয়ে, অভিনেত্রী তাকে বলেছে, ''অভিনয় শিখতে চাও তো আগে রান্না করা, বাসন মাজা প্র্যাক্‌টিস্‌ করো, তারপর স্টেজে নামবে।'' বেচারী ও বিদ্যা জানে না, নাচ-গানের দিকে তার ঝোঁক, তাই

সে রাগ করে ফিরে এল।

তারপর সেই ছেলের সঙ্গে সকালবেলা তার দেখা। ছেলে বললে, ‘‘কাল তুমি কী সুন্দর নাচলে। তুমি আমার বৌ হলে তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না।’’

মেয়েটি তো ভারি খুশি হয়ে বিয়ে করতে রাজি হলো। বুড়োবুড়ীর ভারি আনন্দ! চারজনে মিলে খুব এক চোট নেচে নিলে। ছেলেটি বললে, ‘‘দেখ, কাল আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল তুমি মানুষ নও, পুতুল।’’

মেয়েটি বললে ‘‘এতে আর সন্দেহ কী? মেয়েমানুষ মাত্রেই পুতুল থাকে, যতদিন না তাকে কেউ বিয়ে করে মানুষ করে দেয়।’’

খুব সুন্দর গল্প, খুব সুন্দর অভিনয়। গৃহসজ্জা বড় খাসা হয়েছিল, ঠিক একটি গরীবের কুঁড়ের মতো, দরজা-জানালা সত্যিকারের। এদিক থেকে ইউরোপের থিয়েটারগুলি আমাদের তুলনায় অশেষ উন্নতি করেছে, স্টেজের ওপরে সব রকম দৃশ্য দেখানো হয়ে থাকে। পারীতে (Paris) আমি সমুদ্রে সাঁতার, জাহাজডুবি, কামানের গোলার আগুন ইত্যাদি সত্যিকারের মতো দেখেছিলুম একবার। ‘‘Children's Theatre’’এ অবশ্য অত আয়োজন সম্ভব নয়, ওসবের খরচ উঠবে না। তা ছাড়া ছোটদের কল্পনাশক্তি বড়দের চেয়ে ঢের প্রখর, তারা স্টেজের ওপরে অত কিছু না দেখলেও কল্পনায় দেখতে পারে; তাদের কল্পনাশক্তিকে সজাগ রাখতে হলে যত কম আয়োজন করা যায় তত ভালো।

যাঁরা কাল অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রী নন, ম্যানেজার ও প্রোডিউসার। সুতরাং এঁদের কত খাটতে হয় আন্দাজ করতে পারো! সকলেরই অতিরিক্ত খাটুনি আছে। তাছাড়া সকলেরই ঘর-সংসারের দায়িত্ব আছে। অল্পবয়সের মেয়ে এখন থেকেই অভিনয়ে দক্ষ হচ্ছে ও নিজের জীবিকা অর্জন করছে, এমনটি আমাদের দেশে হবার জো নেই। কাল যেসব খোকা-খুকীরা অভিনয় দেখে ফিরল তাদের কেউ কেউ একটু বড় হয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী হয়ে উঠবে, Ellen Terry যেমন আট বছর বয়স থেকে অভিনেত্রী হয়েছিলেন। এ দেশে বাপ-মা-ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেই এক একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী, এমনও দেখা যায়; যেমন Forbes-Robertson পরিবার। নাচ করা, অভিনয় করা, গান করা, বাজনা বাজানো এ দেশে খুব প্রশংসার কাজ এবং তাই অনেকের জীবিকা। আমাদের দেশে একটি ভদ্রঘরের মেয়ে কেবল বেহালা বাজিয়ে টাকা রোজগার করছে, এমনটি দেখা যায় কি? এখানে তেমন মেয়ে অনেক। অনেক মেয়ে বায়োস্কোপের অভিনেত্রী হতে ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা পায়, অনেক মেয়ে থিয়েটারে ঢোকে। তাদের কত সম্মান!

লন্ডন, ১৩৩৫

জার্মেনী রাইনল্যাণ্ড

আমি এখন রাইন নদীতে জাহাজে করে যাচ্ছি। রাইন নদী সুইট্জারল্যান্ড থেকে বেরিয়ে জার্মেনীর ভিতর দিয়ে হল্যাণ্ডে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এই নদীটির জন্যে দেশে দেশে রেষারেষি, খুনোখুনি বড় অল্প হয়নি। ফ্রান্স বলে, ‘‘আমি এই নদী নেবো।’’ জার্মেনী বলে, ‘‘খবরদার!’’

রাইনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আপন মনে আল্পস্ পর্বতের বার্তা নর্থ সী’র কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে অবিশ্রান্ত ছুটেছে। যে পথ দিয়ে সে ছুটেছে সে পথে ছোট-বড় অনেকগুলি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, তারা দু’ধারে দাঁড়িয়ে দেখছে তার চলা।

সবচেয়ে বড় শহরটির নাম কোলোন। সেইখান থেকে আজ রেলে চড়ে Bonnএ এলুম, বন্ থেকে জাহাজ ধরলুম। উজানে চলেছি, বন্ থেকে Bingenএ। জাহাজটা যাবে Mainz অবধি। এই সমস্ত অঞ্চলকে বলে রাইনল্যাণ্ড। এখনো রাইনল্যাণ্ডে ফরাসী, ইংরেজ ও বেলজিয়ান সৈন্য আছে, ট্রিয়ারের এক গির্জা দেখতে গিয়ে সেই গির্জার বুড়ীর কাছে শুনলুম। ট্রিয়ার অতি প্রাচীন শহর, জার্মেনীর প্রাচীনতম। রোমানরা সেই শহরে দুর্গ প্রভৃতি তৈরী করেছিল, এখনো ভগ্নাবশেষ আছে। রোমানদের ভাঙা amphitheatre দেখে তখনকার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হয়। আমাদেরি মতো তারা খোলা জায়গায় ‘‘যাত্রা’’ অভিনয় করতো, দর্শকরা বসতো স্টেজকে ঘিরে বৃত্তাকারে।

এখানকার ট্রিয়ার শহরে মধ্যযুগের ক্যাথলিক গির্জাটি একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য। ক্যাথলিকরা ইউরোপের হিন্দু অর্থাৎ পৌত্তলিক। তাদের গির্জার সর্বত্র সাধু ও সাধ্বীদের সুনির্মিত মূর্তি ও সুচিত্রিত জীবনকাহিনী। ঘন্টা বাজছে, প্রদীপ মিটমিট করছে, ভক্তেরা জানুপাতপূর্বক ইষ্টমূর্তির কাছে মনস্কামনা জানাচ্ছে। ধূপধুনার গন্ধও পাওয়া যায়। হিঁদুয়ানীর সমস্তই আছে, কেবল পাণ্ডা-পূজারীর হট্টগোলটুকু নেই। গির্জাগুলোর চূড়ো সংকীর্ণ হতে হতে আকাশে মিশে গেছে, কোনো কোনোটা দু’শো তিনশো বছর ধরে তৈরী, দেখলে শ্রদ্ধা হয়।

ট্রিয়ার শহর মোজেল্ নদীর কূলে। মোজেল্ নদী Koblenz শহরে রাইন নদীর সঙ্গে মিলেছে। Koblenz-এর এক দিকে Bingen ও Mainz, অন্য দিকে Bonn ও Cologne. আমি ট্রিয়ার থেকে কোলোনে গিয়েছিলুম রেলে। রেল চলে নদীর ধারে ধারে, প্রথমে মোজেল্ নদীর ধারে, পরে রাইন নদীর ধারে। রেলের এক দিকে নদী, অন্য দিকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে দ্রাক্ষার (vine) চাষ। তা থেকে মদ প্রস্তুত হয়।

রাইনল্যাণ্ড মদের জন্যে বিখ্যাত। দু’রকম মদ এদেশের লোকে খায়—রাইন মদ

ও মোজেল্ মদ। তা ছাড়া বিয়ার অবশ্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পানীয়। কোনো একটা রেস্তরাঁতে গিয়ে জল চাইলে মুশকিলে পড়তে হয়, কেননা জল কেউ খায় না বলে কেউই রাখে না। খাবারের সঙ্গে এরা হালকা মদ খায়—বিয়ার কিংবা মোজেল্-মদ কিংবা রাইন-মদ। জল চাইলে সোডা-ওয়াটার এনে হাজির করে, lemon squash গোছের কিছু আনতে বলতে হয়। যে রকম সরবৎ বুস্-গ্রামে খেয়েছিলুম, সে রকম সরবৎ আপেল ফল থেকে ঘরে তৈরী করা। কাজেই হোটেলে সে জিনিস মেলে না।

কোলোনের গির্জা ইউরোপের একটি নামজাদা গির্জা। সেটি ছাড়া আরো পুরোনো গির্জা কোলোনে আছে। ক্যাথলিকরা যে কেমন সৌন্দর্যপ্রিয় তাদের গির্জায় গেলে তার পরিচয় পাই। গির্জাকে আশ্রয় করে ইউরোপের সঙ্গীত ও চিত্রকলা অভিব্যক্ত হয়েছে। গির্জার সমবেত সঙ্গীত ও সমবেত উপাসনা খ্রীস্টানকে যেমন ঐক্য দিয়েছে, হিন্দু তেমন ঐক্য কোনোকালে পায়নি।

কোলোনেও রোমান যুগের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেটিও একটি প্রাচীন শহর। কিন্তু প্রাচীন হয়েও সেটি চির-আধুনিক। প্রতিদিন তার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। এখন আন্তর্জাতিক প্রেস প্রদর্শনীর জন্যে একটি উপনগর তৈরী হয়েছে। সমগ্র উপনগরটি জুড়ে আন্তর্জাতিক প্রেস প্রদর্শনী বসে। তা দেখতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষের মাত্র দু'চারখানা সংবাদপত্র দেখলুম। বড় দুঃখ হলো। চীনদেশ থেকে লোক এসেছে কাগজ তৈরী করে দেখাতে, আমেরিকার লোক এসেছে রঙীন ছবি ছেপে দেখাতে। জার্মেনীর লোক সংবাদপত্র মুদ্রণের আধুনিকতম কৌশল দেখায়। তিন-চার মাইল জুড়ে বিরাট প্রদর্শনী— তার মধ্যে একটা ছোট রেল্ লাইন পর্যন্ত আছে, তাতে চড়ে এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাওয়া যায়।

জার্মান ছেলেমেয়েরা পিঠে একটা Knapsack বেঁধে দল করে বেড়ায়। খুব ছোট ছেলেমেয়েদের দলে একজন বয়স্ক গাইড থাকেন। বেশী বয়সের যুবক-যুবতীরাও খাকী পোশাক পরে ও পিঠে খাকী Knapsack বেঁধে বেড়ায়। পোশাকের বালাই জার্মেনীতে কম। এই চিঠি লিখছি আর নদীর এক ধারে এক দল ছেলেকে পোঁট্‌লা, লাঠি ও পতাকা নিয়ে দল বেঁধে যেতে দেখ্‌ছি। জার্মানীর পথে-ঘাটে এই Wandervogel-এর দল।

কোলোনে অতি ছোট বাচ্চাদের দল দেখেছি। অগাধ কৌতূহল নিয়ে তারা দেশ দেখে বেড়ায়। কোলোনের ইস্কুলে পড়তে যে সব ছেলেমেয়ে যায় তারাও পিঠে একটা করে চামড়ার ব্যাগ বেঁধে যায়। জার্মেনীতে সকলেরই সাইকেল আছে, সাইকেলের ঝাঁক রাস্তা জুড়ে ওড়ে। অতি ক্ষুদ্র শিশু থেকে অতি বৃদ্ধ ঠাকুরদা পর্যন্ত সকলেই সাইকেল চালায়।

কোলোন থেকে বেরিয়ে বনে এলুম। বন্ ছোট শহর। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবী-বিখ্যাত। সেইখানে Beethoven-এর জন্ম। Beethoven-এর বাড়ী দেখলুম। সেখানে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন সংগৃহীত হয়েছে—তাঁর পিয়ানো, তাঁর কানে পরবার যন্ত্র, তাঁর হাতের লেখা, তাঁর ছবি। তাঁর ছবির মধ্যে তাঁর ঝড়ঝঞ্ঝাময় জীবনের ইঙ্গিত আছে। দেখলেই তাঁর সমস্ত জীবন মনে পড়ে যায়। কী কঠোর সাধনা, কী কঠিন দুঃখ! জগৎকে যিনি অমৃতময় সঙ্গীত দিয়ে গেলেন, নিজের সঙ্গীত তিনি নিজে শুনতে পেতেন না— তিনি হয়ে গিয়েছিলেন বধির। তাঁকে দেখবার সময় আমার মনে হলো— মহাপুরুষদের প্রতি আমাদের একটা ঋণ আছে, সে ঋণ শোধ করবার একমাত্র উপায় নিজে মহাপুরুষ হওয়া। হাত জোড় করে প্রণাম করা কাপুরুষতা, সম্মান দেখাতে যদি চাও তো সমকক্ষ হও।

বন্ থেকে জাহাজে চলেছি। নদীটি কিন্তু কলকাতার গঙ্গার চেয়ে চওড়া নয়। অথচ এই নদীকে নিয়ে কত গান, কত কাহিনী, কত যুদ্ধ। জাহাজ ও নৌকায় নদীটি সব সময় সেজে রয়েছে। ফরাসী জাহাজ স্ট্রাস্‌বুর্গ্ যাচ্ছে, ওলন্দাজ জাহাজ রটারডাম যাচ্ছে, জার্মানি জাহাজ হামবুর্গ্ যাচ্ছে। কত রকম নৌকোয় যুবক-যুবতী দাঁড় টেনে রোদ পোহাতে পোহাতে চলেছে, তাদের গা খোলা। সাঁতার দিচ্ছে ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী—একা কিংবা দলে দলে।

জার্মেনীতে আজকাল সাঁতারের ধুম, নৌ-চালনার ধুম। যার শরীর আছে সেই শরীরচর্চা করে। যুদ্ধে হেরে জার্মানরা ঠিক করেছে এমন একটা দুর্জয় জাতির সৃষ্টি করবে যে জাতির সঙ্গে কোনো বিষয়ে কোনো জাতি পেরে উঠবে না। সে জাতি সৃষ্টি করতে হলে মেয়েদের সাহায্য চাই। তাই যেমন স্কুলে-কলেজে তেমনি মাঠে-নদীতে-আকাশে-সমুদ্রে মেয়েদের অবারিত দ্বার—অবাধ স্বাধীনতা। জার্মেনীর অন্যান্য অঞ্চলের কথা জানিনে, কিন্তু এই রাইনল্যান্ডের মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শ্রী দেখে অবাক হতে হয়।

নদীরে দু'ধারেই রেলপথ, পাহাড়, ক্ষেত। স্থানে স্থানে গ্রাম বা নগর। কোনো কোনো প্রাচীন ধরনের বাড়ী দেখতে ছবির মতো। ফ্যাক্টরীও স্থানে স্থানে আছে— কদাকার। কোথাও কেউ ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। কোথাও কারা ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসেছে।

আজ চমৎকার দিনটি। সূর্যের অসীম দয়া। আমাদের মতো অনেকেই জাহাজ করে বেরিয়েছিল, তারা ফিরছে, তাদের জাহাজে থেকে তারা হাত নেড়ে আমাদের প্রীতি জানাচ্ছে। যারা সাঁতার কাটছে তারাও হাত তুলে প্রীতি জানাচ্ছে। একটা নৌকোর উপরে একটা কুকুর দৌড়াদৌড়ি করতে করতে ঘেউ ঘেউ করে আমাদের কেমন প্রীতি জানাচ্ছিল তার মর্ম সেই বোঝে! নদীর ধারে পাহাড়ের তলে ট্রামও চলেছে।

পাহাড় ঘেঁষে উঠেছে প্রাচীন দুর্গ, Drachenfels। এর নামে কবি Byron-এর এক কবিতা আছে; পাহাড়ের মাথায় সেই ভাঙা দুর্গ। সর্বত্রই দেখছি হোটেল আর

কাকে। আমেরিকানদের দৌলতে পৃথিবীর গরীব দেশগুলোর লোক হোটেল চালিয়ে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে।

এখন আমাদের জাহাজ যেখান দিয়ে চলেছে সেখানটার প্রায় চারিদিকেই পাহাড়। মনে হচ্ছে যেন একটা হ্রদের ভিতর দিয়ে চলেছি। পাহাড়ের পায়ের নীচেই নদী; নদীরে পাড় ধরে ট্রেন চলেছে। পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের প্রীতি জানাচ্ছে কত লোক, দূরস্থিত ঘরের জানালা থেকে প্রীতিসূচক হাত-নাড়া পাচ্ছি আমরা। ট্রেন থেকে, মোটর থেকেও রুমাল নেড়ে লোকে প্রীতি জানাচ্ছে।

Bingenএ জাহাজ থেকে নেমে Frankfurt-এর ট্রেন ধরতে গিয়ে দেখি এক ঝাঁক Wandervogel (উড়ো পাখী)। তারাও ট্রেনে উঠতে ছুটলো। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলো—জার্মেনীর রেলে চতুর্থ শ্রেণী অবধি আছে। আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর মতো জার্মেনীর Third ও Fourth Classএ কাষ্ঠাসন। এই Wandervogel-এর ঝাঁকটির একজনের একটি পা নেই, সে কাঠের পায়া বেঁধে পরম উৎসাহে ছুটছিল। ওরা নেমেছে ও সমবেত গান ধরেছে। কী মধুর শোনাচ্ছে ওদের সমবেত গান! কোথায় আমাদের মতো চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় করবে, না ওরা এমন মিষ্টি গান ধরেছে যে কী বল্‌বো!

* * *

Frankfurt-on-Main.

আজ সকালে রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমে যাদের দেখলুম তারা একদল Wandervogel—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, কারুর কারুর পিঠে রান্নার ডেক্‌চি। আরেকটু পরে একজন পথিককে দেখলুম, তার পিঠে পোঁটলা, কম্বল ও লাঠি একত্র বাঁধা। দু'জন ছেলেকে দেখলুম রুটি চিবোতে চিবোতে পথ চলছিল। রাস্তায় যত ছেলেমেয়ে দেখি সকলের পিঠে একটি পোঁটলা বা ব্যাগ্ বাঁধা।

সাইকেল জার্মেনীর সব শহরে এত বেশী যে সাইকেলের চাপে মারা পড়বার ভয়। একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাট্‌খানা সাইকেলে সব বয়সের মেয়ে-পুরুষ রাস্তা জুড়ে চলে।

কোলোনের মতো এখানেও গীর্জা ও মিউজিয়াম অনেক। মিউজিয়ামে এত দেশের বড় বড় শিল্পীর ছবি থাকে যে কেবল একবার দেখে এলে কত শিক্ষা, কত আনন্দ হয়। যারা ভালো করে ছবি আঁকা শিখতে চায় তারা মিউজিয়ামের ছবির কাছে বসে ছবির নকলে আঁকে। অনেক বুড়ো-বুড়ীকে পর্যন্ত এই কাজ করতে দেখেছি লণ্ডনে ও প্যারিতে।

বটানিক্যাল গার্ডেনে কনসার্ট শুনলুম। অনেকে সেখানে টেনিস্‌ও খেলছিল। ছোট ছেলে মেয়েতে বাগানটা ভরে গিয়েছিল। একটা ছেলেমেয়েদের মতো shingle করেছে দেখে হাসি পেল। জার্মেনীতে এক কালে ছেলেরাও ঝুঁটি বাঁধতো। Beethoven

ও Goethe ছেলেবয়সে ঝুঁটি বাঁধতেন। এখন কিন্তু জার্মানরা সাধারণতঃ নেড়া। তারা ক'বার বেলতলায় যায়? এই শহরেই Goethe-র জন্ম। তাঁর বাড়ী দেখলুম। বাড়ীটি সেকালের মতো করে সাজানো।

মেইন নদীর কূলে এই শহর। নদীর এক একটা অংশ ঘেরাও করে গোটাকয়েক swimming bath করা হয়েছে। তার দেয়ালগুলোতে ছবি আঁকা। তাতে সারাক্ষণ কন্‌সার্ট চলে। গান ও ছবির আবহাওয়ায় খোলা আকাশের তলে খোলা বাতাসে যারা সাঁতার কাটে, তাদের কেউ বা বৃদ্ধ, কেউ বা বালিকা। প্রায় সকলেরই গা খালি। সাঁতারের পরে তাদের কেউ কেউ skip করে, কেউ কেউ বল খেলে, কেউ কেউ কুস্তি লড়ে এবং অনেকে একখানা তক্তার উপরে শুয়ে রোদ পোহায়। এ সব swimming bath তৈরী করে দেওয়া হয়েছে ম্যুনিসিপ্যালিটি থেকে।

জার্মেনীর ম্যুনিসিপ্যালিটিগুলোর নিজেদের ট্রাম আছে। ম্যুনিসিপ্যালিটির টাকায় অপেরা হাউস ও থিয়েটার চলে। ম্যুনিসিপ্যালিটির বাড়ীর নীচের তলায় ভোজনাগার করে দেওয়া হয়েছে, তাতে শস্তায় ভালো খাবার দেওয়া হয়। এই সব ভোজনাগার দু'-তিনশো বছর ধরে চলে আসছে। আজ এক অন্ধকে দেখেছিলুম, তার সঙ্গে এক ক্রসচিহ্নিত কুকুর। সেই কুকুর তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

* * *

Heidelberg.

হাইডেল্‌বার্গের বিশ্ববিদ্যালয় ৬৫০ বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত। জার্মেনীতে বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু হাইডেল্‌বার্গ সব চেয়ে রোমান্টিক। জার্মেনীর একটি প্রসিদ্ধ গানের প্রথম কথা— "হাইডেল্‌বার্গে আমি হৃদয় হারিয়েছি।" নেকার নদীর কূলে দু'টি পাহাড়ের পাদদেশে এই ছোট শহরটির অবস্থিতি, পাহাড়ের উপরে এক বৃহৎ দুর্গ ও উদ্যান।

হাইডেল্‌বার্গেও দেখলুম তেমনি সুইমিংবাথ, তেমনি দাঁড়-টানা, তেমনি ঘাসের উপরে খোলা গায়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে সূর্যালোক অনুভব, তেমনি পক্ষী-পক্ষিণীদের দল (Wandervogel)। সারা জার্মেনী যেন ক্ষেপে গেছে। বুড়োবুড়ীরা বাধা দেবে কোথায়, না বুড়োবুড়ীরাই অগ্রণী! দেশের দুঃখ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মর্মে বিঁধেছে। তরুণে প্রবীণে গালাগালি, দলাদলির অবসর নেই। দুর্গম পথে ছেলেদের নেত্রী হয়েছে এক বুড়ী, তার পিঠে বস্তা। পাঁচ বছরের খোকাখুকী নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গুরুজন দাঁড়িয়ে দেখছেন।

* * *

Wurzburg
৮ই সেপ্টেম্বর

এটি একটি প্রাচীন ছোট শহর। জার্মেনীর প্রত্যেক শহরের অধিকাংশ গ্রামে ট্রাম আছে। তোমরা যখন জার্মেনী আসবে ততদিনে সমস্তটা জার্মেনী ট্রামে করে ঘোরবার উপায় হয়ে থাকবে।

এখানকার জার্মানরা দেখছি পেয়ালা পেয়ালা নয়, গেলাস গেলাস নয়, ঘড়া ঘড়া বিয়ার খায়। জলও আমরা এত খেতে পারিনে, পেট ভরে যায়। এখানে সেকালের এক মোহান্ত মহারাজের (Prince Bishop) প্রাসাদ আছে, এখন সেটা জাতীয় সম্পত্তি। প্রাসাদটি মহারাজের সৌন্দর্যপ্রিয়তার নিদর্শন চিত্রে, ভাস্কর্যে, বাস্তুকলায় বহন করছে। এখানেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এটি চিকিৎসা-বিদ্যার জন্যে প্রসিদ্ধ।

এখানেও Wandervogel ও সাঁতার আর দাঁড় টানার রেওয়াজ। আরেকটা রেওয়াজ ছবি আঁকার। প্রৌঢ়া Nunরা পর্যন্ত কাগজ আর ক্রেয়ন নিয়ে বসে গেছেন।

একটা হাট দেখলুম। হট্টগোল বাদ দিলে ঠিক আমাদের হাট। শাকসব্‌জীওয়ালী বুড়ীদের কেউ কেউ শাকসব্‌জীর ঝুড়ি নিয়ে গির্জায় বসে মনস্কামনা জানাচ্ছিল। আরেকটি গির্জায় কতগুলি মনোযোগী বালক-বালিকা আচার্যের কাছে ধর্মশিক্ষা করছিল।
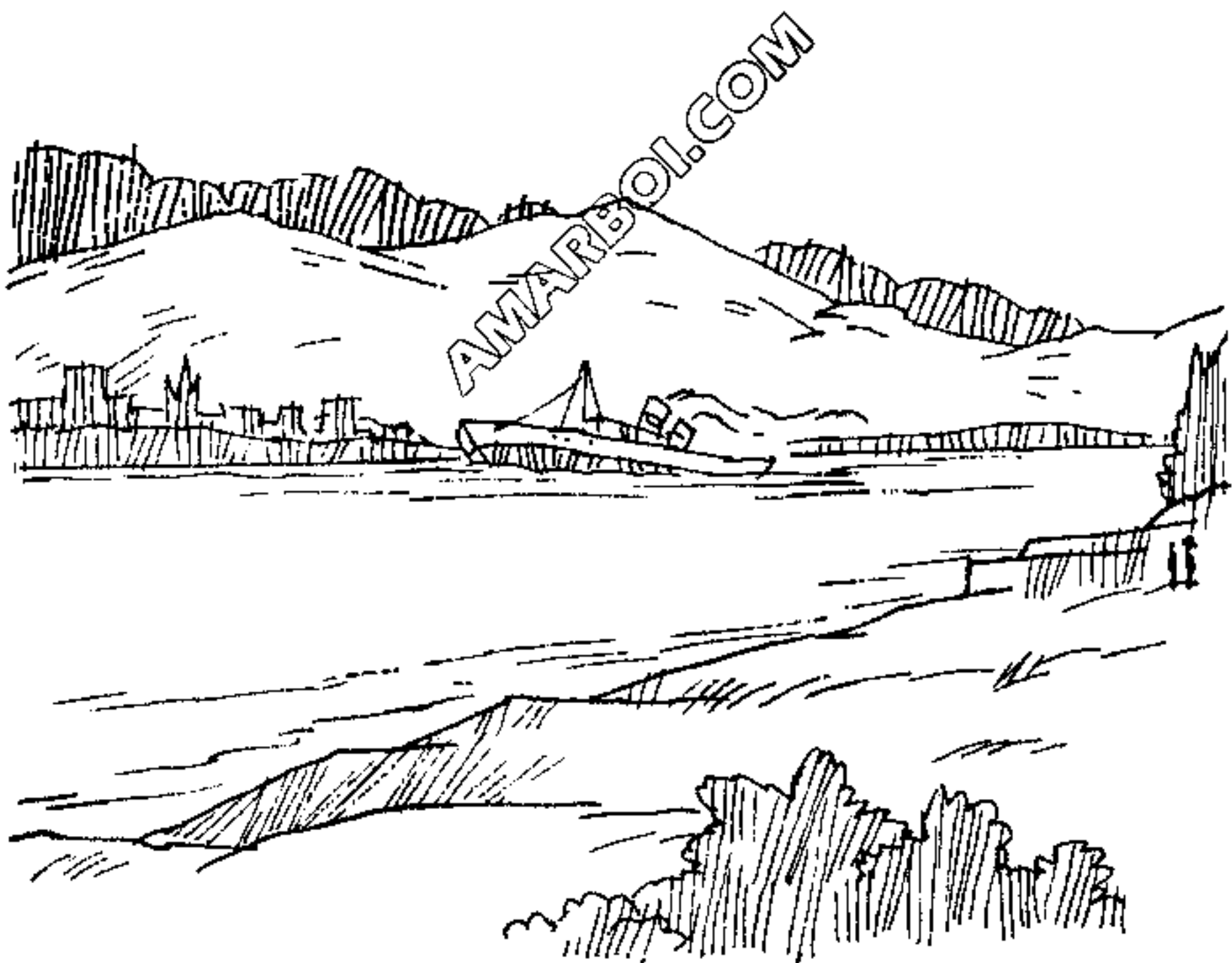
সুইট্জারল্যাণ্ড

বড়দিনের ছুটিতে লণ্ডন ছেড়ে লেজাঁয় গিয়ে দেখি সে এক তুষারময় স্বপ্ন, যেন নিসর্গের তাজমহল। নিবিড়-নীল অকূল আকাশে সেটি একটি পর্বতদিগ্‌বলয়িত নিরালা তুষারদ্বীপ, তার মাটি বরফের, মেঘ বরফের; তার জলস্থল-অন্তরীক্ষের ভিৎ দেয়াল ছাদ মর্মরনিভ বরফের! যেন আকাশসিন্ধুর ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড়ের পর পাহাড় হয়ে উঠেছে আর ফেনায় ফেনায় মাটির বেলা ঢেকে গেছে। সে আকাশ এতই নীল আর এত উজ্জ্বল আর এত সুন্দর যে চাতকের মতো দিবারাত্র অনিমেষ চেয়ে থেকে সাধ মেটে না, মনে হয় এ এক মহার্ঘ্য বিলাসিতা, শুধু এরি জন্যে এক সমুদ্র একাধিক নদী পেরিয়ে ফ্রান্সের এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেল্‌দৌড় দিয়ে সুইস্ আল্পসের শাখাশিখরে উঠতে হয়। সে তো লণ্ডনের মাথার ওপরে শামিয়ানার মতো খাটানো দশহাত উঁচু দশহাত চওড়া দশহাত লম্বা আকাশ নয় যে চোখ বাড়ালেই নাগাল পাব, মন বাড়ালেই মাথা ঠুকে মরব, দশদিকের পেষণে ধৃতনিঃশ্বাস হব। লেজাঁয় যেদিন নামলুম সেদিন অসহ আনন্দে নিজেকে শতধা করতে পারলে বাঁচতুম। মুক্ত আকাশের মধ্যে মানবাত্মার যে মুক্তি আর কিছুরই মধ্যে তা নেই। সেই আকাশকে যারা কয়লার ধোঁয়া নিয়ে কালো ক'রে দশতলা বাড়ির ঘের দিয়ে খাটো ক'রে তুলেছে তারা কুবের হলেও কৃপার পাত্র, তারা স্বখাদসুড়ঙ্গতলের যখ।

সেই উজ্জ্বল নীল প্রশস্তপরিধি আকাশে যখন এক পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্য উঠি-উঠি করে, মেঘের মুখে সেই সংবাদ পেয়ে আর পাহাড়ের এপারের বরফ হীরের মতো ঝক্‌ঝক্ করে, রঙের সপ্তকের ওপর আলোর আঙুল ঝল্‌মল্ ঝিল্‌মিল্ ক'রে পিয়ানোর ঝংকার তুলে যায়, তখন মুহূর্তের জন্যে অনুভব করতে পারি আদিযুগের ধ্যানীর চেতনায় কেমন জ্যোতি ঝলসে উঠেছিল, কোন আবিষ্কারের অসম্বরা বাণী তাঁর কণ্ঠভেদ ক'রে আপনি ফুটেছিল, কিসের আনন্দ তাঁকে বলিয়েছিল—শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ...জানাম্যহং তং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সারাদিন সূর্যকিরণ ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে চলে আর মাটির বরফ মাঠের বরফ গাছের বরফ ছাদের বরফ ঝরণার বরফ পাহাড়ের বরফ কখনো সোনা হয়ে ওঠে রূপালী রঙের মুকুরে সোনালী মুখের ছায়ার মতো, কখনো রাঙা হয়ে ওঠে শ্বেতপদ্মিনীর কপোলে অশোক-রঙা লজ্জার মতো, কখনো নীলাভ হয়ে ওঠে শ্বেত শঙ্খিনীর নয়নতারায় নীল চাউনির মতো।

সূর্য বিদায় নিলে চন্দ্রের পালা। চাঁদের অপলক দৃষ্টির তলে তুষারময়ী পুরী বিবশার মতো শায়িতা, তার তরুণ দেহের নিটোল কঠিন চূড়ায় চূড়ায় জ্যোৎস্নার চুম্বন, তার রজত আভরণের গাত্রে তারার ঝিকিমিকি। দস্তুর পর্বতের সারি পার্শ্বরক্ষীর মতো

সারারাত্রি পাহারা দিচ্ছে, বিমুগ্ধা ""পালেশ""গুলি গবাক্ষের ঘোমটা তুলে বিজলী-আলোয় উঁকি মেরে দেখছে, টোপর-পরা পাইনগাছের দল স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মতো খাড়া রয়েছে।

শুধু শোভা নয়, সংগীত। এক নিশান্ত থেকে আরেক নিশান্ত অবধি মিষ্টি সুরের নহবত বাজে গ্রাম-কুক্কুটের অবসন্ন কণ্ঠে, তার সঙ্গে সুর মিলায় শ্লেজবাহী অশ্বের গলার ঘণ্টা, তার সঙ্গে তাল দেয় গিরিগৃহত্যাগিনী ঝরণার 'চল্ চল্ চল্'। দিনের কাজের সঙ্গে রাতের স্বপ্নের সঙ্গে চেতনার আড়ালধ্বনি মিশিয়ে রয়, যারা কাজ করে স্বপ্ন দেখে তারা হয়তো শুনতে পায় না জানতে পারে না কিসে তাদের অমৃত দেয়।

কাজ? সেখানকার কাজের নাম খেলা, ডাকঘরের ছোকরা চিঠি বিলি করতে যাচ্ছে, তার গাড়িখানার না আছে চাকা না আছে ঘোড়া, দুই হাতে একবার ঠেলা দিয়ে দুই পায়ে দিলে গাড়ির মধ্যে লাফ, গাড়ি চলল বরফ-ঢাকা ঢালু রাস্তায় পিছলে, এক রাস্তার থেকে আরেক রাস্তায় বেঁকে, এক দরজা থেকে আরেক দরজায় থেমে। এক বাড়ির লোক আরেক বাড়ি যাচ্ছে, যার পিঠে চড়ে বসেছে সেটার নাম লুজ, উঁচু একখানা পিঁড়ির মতো তার আসনটা, বাঁকা দুখানা শিঙের মতো তার পাখা দুটো; চ'ড়ে ব'সে পা তুলে নিয়ে হাত ছেড়ে দিলে বরফের রাস্তার ওপর ঘষতে ঘষতে চলে।

যারা খেলা-ই করতে চায় তারা দুই পায়ে দুটো নৌকাকৃতি কাঠ বেঁধে হাতের লগি তুলে নিচ্ছে, আর দুই নৌকোয় পা রেখে জমাট জলের ওপর দিয়ে রসাতলে নেমে যাচ্ছে। এরি নাম শী-খেলা (skiing)। শুধু খেলা করতে কত দেশ থেকে কত পুরুষ কত নারী প্রতি শীতকালে সুইট্জারল্যাণ্ডে আসে, বরফের ওপর দিয়ে পাহাড়ে ওঠে, শী করে, স্কেট্ করে, লুজে চড়ে, স্লেজে চড়ে। কী অমিতোদ্যম স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা! ভূতের মতন খাটতে পারে, শিশুর মতন খেলতে পারে, যুবক-যুবতীর তো কথাই নেই, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও উৎসাহ দেখলে মনে হয় বানপ্রস্থে গেলে এরা বনকে জ্বালাত।

খাটো আর খেলো আর খাও—এই হচ্ছে এদের ত্রি-নীতি। ইউরোপে এতদিন আছি কাঁদতে কাউকে দেখিনি, কান্নাটা এদের ধাতবিরুদ্ধ। যার মুখে সহজ হাসি নেই তার অন্তত হাসির ভান আছে, কিন্তু সহজ হাসি নেই এমন মানুষ তো দেখিনি। আর দিক থেকে দেখতে গেলে খুব একটা গভীরতার দাগও কারো মুখে দেখিনি: তরঙ্গহীন শান্তি অন্তঃসলিলা অনুভূতি অতলস্পর্শ তৃপ্তি কারো চোখে মুখে চলনে বলনে দেহের গড়নে লক্ষ্য করিনে।

সাত্ত্বিকতার চর্চা ইউরোপে নেই, কোনো কালে ছিল না। ইউরোপের খ্রীষ্টধর্ম যীশুর ধর্ম নয়, সেন্টপলের ধর্ম—রামের ধর্ম নয়, হনুমানের ধর্ম। যার মধ্যে বীর্য

আছে, লাবণ্য নেই।

কিন্তু লাবণ্য নাই থাক, ক্লীবত্ব নেই। প্রচণ্ড শীতে যে দেশে দেহের রক্ত হিম হয়ে যায়, দেহকে সে দেশে মায়া বলে কার সাধ্য ? দেহরক্ষার জন্য সে দেশে এত রকমের এত কিছু তোড়জোড় চাই যে, তার আহরণে সামান্য অনবহিত হলে 'দেহরক্ষা' অবশ্যম্ভাবী।

সেই জন্যে দেহ থেকে দেহোত্তরে উঠতে, হয় উপনিষৎ লিখতে নয় মোহমুদ্গর লিখতে, ইউরোপের লোক কোনো দিনই পারলে না। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনকে নিয়ত উত্তপ্ত রাখতে যারা ব্যাপৃত, শীতল শান্তির সুযোগ-অবকাশ তাদের দেহমনের আবহাওয়ায় কই ?

এদের ভিতরে বাহিরে কেবলি দ্বন্দ্ব কেবলি ব্যস্ততা, এদের মনীষীরা সত্যকে পান দ্বৈরথ-সমরে, তাঁদের মনন একটা যুদ্ধক্রিয়া। এদের দেহীরা নিজেদের অভাব মেটায় প্রকৃতির স্তনে দাঁত বসিয়ে, তাদের জীবনধারণ প্রকৃতির ওপর দস্যুতায়।

ইউরোপের মাটি বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দেয় না, বিনা যত্নে তাতে নীবার ধান্য গজায় না, তার ঝরণার জল এত হিমেল যে স্টোভে গরম না করলে ব্যবহারে লাগে না। বাল্মীকি যদি এদেশে জন্মাতেন তবে ধ্যান করতে ব'সে বল্মীকে নয় বরফে ঢেকে যেতেন ; বুদ্ধদেব যদি এদেশে জন্মাতেন তবে তপস্যায় ব'সে কোন সুজাতার কল্যাণে ক্ষুধাশান্তি করতে পেতেন হয়তো, কিন্তু বেশীক্ষণ খালি গায়ে থাকলে তাঁকে যক্ষ্মাচিকিৎসালয়ের সুজাতাদের শুশ্রূষা গ্রহণ করতে হতো।

ইউরোপের সেই নিষ্ঠুরা প্রকৃতিকে মানুষ দেবী ব'লে পূজা করেনি, কালী ব'লে তার পায়ের তলায় শব বিছিয়ে দেয়নি, তার বিষদাঁত ভেঙে তাকে নিজের বাঁশির সুরে খেলিয়েছে, তাই একদিন যে ছিল নিষ্ঠুর আজ সে-ই হয়েছে কৌতুকের। তাই বরফ পড়লে কোথায় ভয় পেয়ে ঘরে লুকিয়ে আগুন জ্বালবে, না, মানুষ বেরিয়ে পড়ল বরফের বুকের ওপর পা রেখে কালীয় দমন করতে— স্কেট করতে শী করতে লুজে চড়তে শ্লেজে চড়তে।

সুইট্জারল্যাণ্ডের এই পার্বত্য পল্লীটি জেনেভা হ্রদের অনতিদূরে ও অনতিউচ্চে। প্যারিস থেকে লোজান ছাড়িয়ে মিলানের পথে ট্রিয়েস্টের অভিমুখে যে রেলপথটি এঁকেবেঁকে চলে গেছে এগ্লের কাছে তাকে নিচে রেখে অন্য একটি রেলপথে পাহাড়ের পর পাহাড় উঠতে হয়।

এই রেলপথটি শীর্ণকায় এবং এর ট্রেনগুলি ছোট। পাহাড়ের ওপর ওঠবার সময় পেছনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে শিশুর মতো হামাগুড়ি দেয়, পোকার মতো মন্থর বেগে চলে। পথের দু'পাশে দু'সারি পাহাড় কিংবা একপাশে পাহাড় ও একপাশে খাদ। দু'পাশে পাইনের বন, বনের ফাঁক দিয়ে ঝরণা ঝ'রে পড়ছে। পাইনের কাঁচা চুলে পাক ধরিয়ে দিয়েছে বরফ গুঁড়ো, ঝরণার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছে বরফের বাঁধ।

গ্রামটি নিকট হয়ে এলে দু'টি করে "শালে" দেখা দেয়। "শালে" (Chalet) হচ্ছে এক ধরনের বাড়ি, যেমন আমাদের দেশে "বাংলো"। বাড়ির আগাগোড়া কাঠের, কেবল ছাদটা হয়তো স্লেটের এবং ভিতরটা হয়তো পাথরের। প্রত্যেকটির গঠন স্বতন্ত্র, স্থিতি ছাড়া ছাড়া, আকার বিভিন্ন, এবং রঙের সমাবেশ বিচিত্র। দো-চালা ছাদ, ঝুলানো বারান্দা, ছোট গবাক্ষ, জ্যামিতিক নক্সা, রঙিন আলপনা, উৎকীর্ণ উক্তি, দু'তিনশো বছর বয়স— সব মিলিয়ে প্রত্যেকটি এমন একটি বিশিষ্ট দৃশ্য যে একবার চাইলে চোখ আটকে যায়, ফিরিয়ে নেবার সাধ্য থাকে না।

দেশটির প্রকৃতি এত সুন্দর, তাতেও মানুষের তৃপ্তি হলো না, সে ভাবলে এমন সুন্দর আকাশ এমন সুন্দর পাহাড় এমন সুন্দর বরফ পাইন ঝরণা, দশদিকে এমন অকৃপণ সৌন্দর্য, কিন্তু এর মধ্যে আমি কোথায়? এই ভাবে সে বাইরের সৌন্দর্যের সঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্য মাখিয়ে দিলে, সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব জুড়ে দিলে, বিধাতার সৃষ্টি আর মানুষের সৃষ্টি, এ বলে আমায় দ্যাখ্ ও বলে আমায় দ্যাখ্। তিন dimension-এর ছবির মতো বহু কোণ "শালে," ধাপে ধাপে লাফ দিয়ে নামা পাথর-বাঁধানো ঝরণা, বাঁকে বাঁকে ঘুরে-ঘুরে নামা পাহাড় কাটা রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে গাছ, রাস্তার স্থানে স্থানে বেঞ্চি, দুশো তিনশো বছরের বাড়িতেও অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য, বিজলী আলো জলের কল সেণ্ট্রাল হীটিং।

ইউরোপের লোক যুগোচিত পরিবর্তন বোঝে। সেইজন্য চার হাজার ফুট উঁচু পর্বতশ্রেণীর পিঠে নিরালা একটি ছোট্ট গ্রামে বাস ক'রে কোনো কিছুর অভাব বোধ করে না, লেজাঁর পাঁচ দশ মাইল দূরের দুটি গ্রামে বেড়িয়ে এসেছি, সে সব গ্রামেও কম বেশী এমনি স্বাচ্ছন্দ্য, অস্থায়ী পর্যটকদের জন্য অন্তত কয়েকটি কাফে তো আছেই।

লেজাঁ গ্রামটিতে দু'তিন হাজার লোকের বাস, তাদের বোধ হয় অর্ধেক নানা দিগ্‌দেশাগত যক্ষ্মারোগী। ইংরেজ আমেরিকান জার্মান ওলন্দাজ হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান পর্তুগীজ ইতালিয়ান জাপানী ভারতীয়— কত নাম করবো। তাঁদের মধ্যে আমাদের এক বাঙালী ভদ্রলোকও আছেন, তাঁর ভাই "রমলা"-কার মণীন্দ্রলাল বসু মহাশয় তাঁর তত্ত্ব নেন।

যক্ষ্মারোগের সৌরচিকিৎসার পক্ষে এই স্থানটির উপযোগিতার কারণ এখানে সূর্যের আলো প্রচুর অথচ তার আনুষঙ্গিক তাপ প্রাচুর্য নেই। শীত ও রৌদ্রের এহেন সমাবেশ অন্যত্র বিরল। পার্বত্য হাওয়া, মুক্ত প্রকৃতি, স্তব্ধ গ্রাম, পাখীর গান, পাইনের মর্মর্, ঝরণার কল্‌কল্, বাসি শেফালীর মতো অতি আলগোছে মৃদু তুষারপাত। একত্র এত গুণ কোন্ শহরের ক'টা গ্রামের আছে?

রোগীর জন্যে কেবল প্রাকৃতিক নয়, কৃত্রিম আনন্দেরও বহুল ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের জন্যে ছোট বড় বহুসংখ্যক ক্লিনিক, তাদের আত্মীয়দের জন্যে বহুসংখ্যক হোটেল, উভয়ের জন্যে দোকান বাজার ডাকঘর ব্যাঙ্ক সিনেমা গির্জা কাফে।

বড় ক্লিনিক ও বড় হোটেলগুলিতে নাচগানের বন্দোবস্ত। যারা দু'তিন বছর একাদিক্রমে শয্যাশায়ী, যাদের পাশ ফিরে শুতে দেওয়া হয় না, তাদের নিজের নিজের ঘরে গ্রামোফোন বাজছে কাগজ পড়া হচ্ছে খাবার পৌঁছচ্ছে নার্স পরিচর্যা করছে বন্ধুরা গল্প করছে। নিজের নিজের ঘর থেকে শয্যাসমেত তুলে নিয়ে তাদের সকলকে একঠাঁই একজোট ক'রে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে সকলে মিলে গল্প করছে কন্সার্ট শুনছে সিনেমা দেখছে এবং তাদের বন্ধুবান্ধবীদের নাচ উপভোগ করছে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

ছেলেবেলায় ''হাসিখুসী'' প্রথম ভাগ হাতে পাওয়া একটি স্মরণীয় ঘটনা। তারপরে তার দ্বিতীয় ভাগ। ছড়াগুলি মুখস্থ হয়ে যায়। এখনো, এই তেষট্টি বছর বয়সেও বেশ মনে পড়ে হারাধনের দশটি ছেলের বিয়োগফল ও যোগফল। তখন খেয়াল হয়নি যে ছড়ার ছলে অঙ্ক শিখছি। আর সেই ছবিগুলিও কী চমৎকার! পরে যোগীন্দ্রনাথের আরো ছড়ার বই পড়ি। ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে গদ্য রচনাও। প্রায় সব ক'খানাই ভালো লাগে। আর মুখস্থ হয়ে যায় বিস্তর পঙ্‌ক্তি।

জানিনে আমার নিজের লেখকজীবনের উপর ছেলেবেলার সেসব পড়াশুনা কোনো ছাপ রেখে গেছে কি না। কিন্তু প্রভাব একভাবে না একভাবে পড়া সম্ভব। অন্তত ছড়ার গঠন যে কেমন ও রস যে কোন্‌খানে এর জন্যে আমি ''খুকুরাণীর ছড়া'' বইখানির কাছে ঋণী। সেই সূত্রে যোগীন্দ্রনাথের কাছে।

ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা কত বই এল আর গেল। যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি এখনো বেঁচে আছে। এখনো জনপ্রিয়।

উপেন্দ্রকিশোরের মতো তিনিও চিরকিশোর।

মানুষ তার কীর্তির ভিতর দিয়েই জীবিত থাকে। যোগীন্দ্রনাথও সেই অর্থে জীবিত। তাঁর বই হাতে নিলে একটি রসিক, আমুদে, অধ্যবসায়ী গুরুমশায়কে পাই, যাঁর কাছে শিক্ষাদান ও আনন্দদান একই ব্রতের দুই দিক।

শিক্ষার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও আনন্দের প্রয়োজন ফুরোয় না। শিশু যখন বড়ো হয় তখনো সে যোগীন্দ্রনাথের ছড়া আওড়ায় আনন্দ দিতে ও পেতে।

এই যেমন—

''দুলতে যখন চাই
ঘোষপাড়াতে যাই
ঠ্যাংটা উঁচু করে দাঁড়ায়
নন্দঘোষের ভাই।
ওই কাঁধে যার চাপ
সে বংশী মুদির বাপ্‌।''

বাকীটুকু মনে পড়ে না। পাঠকরা পূরণ করবেন, যদি স্মরণ থাকে।
(১৯৬৮)

সুকুমার রায়

‘‘সব সুকুমার কুমার ছেলের রায় সুকুমার নামটি চেনা।’’ লিখেছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শিল্পী চারু রায়। ‘রংমশাল’ বলে এক বার্ষিক সংকলনে। প্রায় পঞ্চান্ন বছর পূর্বে। তখন আমিও একজন কুমার ছেলে।

সুকুমার রায়ের নামের সঙ্গে আমার চেনা ‘সন্দেশ’ পত্রিকার জন্মকাল থেকে। তার প্রথম আকর্ষণ ছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গল্প। আর দ্বিতীয় আকর্ষণ সুকুমার রায়ের ছড়া। তা ছাড়া দু’জনেরই আঁকা ছবি।

বেশ মনে আছে যেদিন দেখি ‘‘হাঁস ছিল সজারু— ব্যাকরণ মানিনে। হয়ে গেল হাঁসজারু কমনে তা জানিনে।’’ তার ছবিও মনে আছে বইকি। তেমনি বকচ্ছপ, হাতিমি, গিরগিটিয়া ইত্যাদি কিম্ভূতকিমাকার জন্তু।

‘‘হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল সাদাকে বলেছিলি লাল’’ আমাদের সকলের মুখস্থ হয়ে যায়। পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলেই আমরা অভিনয় করি। তারপর ‘‘রাম গরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা।’’ ‘‘গ্রীষ্মকালে গান জুড়েছেন ভীষ্মলোচন শর্মা’’। ‘‘বড়বাবুর গোঁফচুরি’’ এমনি কত সব মজার ছড়া।

কারই বা মাথায় আসে এসব কৌতুক কল্পনা! মুখে আসে এসব ছন্দ ও মিল!

আর সব পত্রিকা ফেলে ‘সন্দেশ’ নিয়ে বসতুম কেন ? এই জন্যেই। কিন্তু একদিন লক্ষ করলুম সুকুমার রায় আর নেই। পরে কিছুদিন তাঁর রচনা বেরোয়। তারপর পত্রিকাটাই বন্ধ হয়ে যায়।

বড়ো হয়ে পরে ‘বিচিত্রা’ পত্রিকার পৃষ্ঠায় পড়ি তাঁর নাটিকা ‘চলচিত্তচঞ্চরী’। সুকুমার রায় যে বড়োদের জন্যেও লিখতেন তা তো জানতুম না।

ইতিমধ্যে ‘আবোল-তাবোল’ বই হয়ে বেরিয়েছিল। আমরা কাড়াকাড়ি করে পড়ি। ‘হযবরল’ যখন বেরোয় তখন আমি কলেজের ছাত্র। ছড়াও নয়, নাটিকাও নয়, হেঁয়ালী গল্প। অপূর্ব তার রস।

সুকুমার রায়ের জীবনদীপ অকালে নিবে না গেলে তিনি আরো কত কী দিয়ে যেতে পারতেন। বাংলার শিশুসাহিত্যের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা তাঁর সুযোগ্য পুত্র সত্যজিৎ তাঁর বংশের ধারা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। একই বংশের তিন পুরুষ সমান কীর্তিমান, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

সুকুমার রায় বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী নন, কিন্তু দেশের শিশুমানসে তাঁর আদর চিরদিনের। কেউ তাঁকে ভোলেনি ও ভুলবে না। এর মতো গৌরব আর কী আছে!

১৯৭৩

ছড়ার ভূমিকা

আমার নিজের ছড়া লেখা শুরু হয়েছিল এইভাবে— 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের জন্য বুদ্ধদেব বসু ষোলটা কবিতা চেয়েছিলেন। তখন ছড়া পড়তুম। ইংরেজি ক্লেরিহিউ, লিমেরিক, রুথলেস রাইম, ব্যালাড। ছড়া লিখতুম না।

আমার কাছে আদর্শ ছড়া ছিল 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে', 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো', 'হাট্টিমা টিম টিম'— এই সব। একদিকে খাঁটি লোকসংস্কৃতি, মুখে মুখে যা ছড়িয়ে পড়ে, পুরুষানুক্রমিক যা সঞ্চারিত হয়। এসব ছড়া কার লেখা, কবে বানানো কেউ জানে না। আর একদিকে হিউমারাস বা ননসেন্স কিছু। তখন ছড়া পড়তাম।

বুদ্ধদেববাবুর তাগিদে হঠাৎ কিছু ছড়া তৈরি হয়ে গেল। কবিতার মত ছড়ার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, ছড়া বানাবার। ছড়া হয় আকস্মিক, ইররেগুলার। সেখানে আর্ট আছে, আরটিফিসিয়লিটির স্থান নেই।

জনসাধারণের কাছ থেকে আমি কতকিছু নিচ্ছি, অনেককিছু পাচ্ছি, তার বদলে তাদের দিচ্ছি কি ? কিছু না। ফলে তাদের উপযুক্ত করে কিছু দেওয়ার জন্যে একপ্রকার জনসাহিত্যের মত আমি ছড়াকে নিলাম। এমন লেখা যা সেলফ্-কনশাস্ না হয়ে পড়ে। যা পড়ার দরকার নেই, শুনলেই সবাই বোঝে, বুঝতে পারে। যাদের আমরা অশিক্ষিত, সাদামাটা ভাবি তাদের কাছেই আমার অনেক শেখার আছে।

লোক ছড়ায় কতদিনের অভিজ্ঞতা, ফোক্ উইস্‌ডম ধরা থাকে, এ ছাড়া নানান্ সম্প্রদায়ের ছড়ায় এথ্‌নিক ব্যাপারও থাকে।

আধুনিক ব্যঙ্গ বা সূক্ষ্ম কল্পনার চেয়ে আমি চেয়েছিলুম ছড়ার মধ্য দিয়ে ওই সাধারণদের জন্য বলতে। সব সময় পারিনি। আমার ছড়াও কখনো সফিস্‌টিকেটেড হয়ে গেছে।

ছড়া হবে ইররেগুলার, হয়তো একটু আন্‌ইভেন। বাকপটুতা, কারিকুরি নয়।

কবিতা থেকে ছড়া আলাদা। ছড়াকে কবিতার মধ্যে ঢোকাতে গেলে কবিতাকে ব্যাপ্ত করে নিতে হয়। কবিতা তো যে কোনো ভাবেই হয়, যে কোনো ছন্দে, এমন কি গদ্যেও। ছড়ার কিন্তু একটাই ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ছড়ার ছন্দ, একটু দুলকি চালে চলে, শাস্ত্রসম্মত নামও একটা আছে তার। ছড়া ঐ ছন্দেই লেখা যায় শুধু।

আমিও ওতেই লিখেছি। হয়তো কোথাও কোথাও অন্যরকম করছি কিন্তু আসল ছন্দটা ওই। আর ছড়ার মিল। দু সিলেবল হবেই। তিন সিলেবল হলে আরও ভালো হয়। আর শেষে কোন যুক্তাক্ষর থাকবে না।

এসব অনেকে এখন মানেন না, এক সিলেবল মিল দিয়ে ছেড়ে দেন, ক্রিয়াপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের মিল, ফাঁকিবাজি। ইংরেজি ছড়ায় দেখেছি শব্দ কখনো কখনো পুরোটা উচ্চারণ না করে অংশত লিখে ছেড়ে দেয়। বাংলা ছড়াতেও ওটা এখন আসছে।

ভাব ও ছন্দ তো থাকবেই, এছাড়াও ছড়ার থাকবে ইমেজ ও মিল। ছড়ার ইমেজ মিল রেখে আসে না, পারম্পর্য কম। হাট্টিমা টিম টিম। তারা মাঠে পাড়ে ডিম। তাদের খাড়া দুটো শিং— শিং দিয়ে মিলিয়ে দেয়া হল। কমলাপুলির টিয়েটা। সূয্যিমামার বিয়েটা— ইমেজ আসছে হঠাৎ হঠাৎ।

ছড়ার ঐতিহ্য অনেকদিনের, বহু পুরাতনের স্পিরিট, কিন্তু ছড়া নিয়মিত লেখার প্রচলনটা সম্প্রতি হয়েছে, গত তিরিশ চল্লিশ বছরে। এর সম্ভবনা তো অসীম, অনেক কিছু করা যায়। ছড়া হলেই হালকা, সরস হবে না কেন? সব কিছু নিয়েই ছড়া হয়েছে, বীভৎস রস নিয়েও হয়েছে।

ধাঁধা প্রবচন লোকগীতি গাথা সবই তো সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে না। আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে।

ছড়া যদি জনসাধারণ নেয়, শুধু আমি বা আমরা কয়েকজন ছড়া লিখবো, তা আমি কোনদিনই চাই না। সবাই লিখুক, তার মধ্যেই কিছু ছড়া বেঁচে থাকবে, তাহলেই ছড়ার, ছড়ার ফর্মের সার্ভাইভ্যাল সম্ভব। নয়তো শুধু কয়েকজনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আর কি হবে!

তবে এটা তো আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। চেহারায় পোষাকে আচরণে সকলে প্রায় একরকম হলেও শিল্পে, সাহিত্যে প্রত্যেকে নিজস্বতায় বিশ্বাসী। তাই আধুনিক ছড়ায় লোকছড়ার কালেক্টিভ সেন্সটা আর নেই।

আজ প্রত্যেকের লেখার একটা নিজস্ব ঢং এসেছে। মিল, ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রত্যেকের এক এক রকম। আমারটা পড়লে বোঝা যায় এটা আমার ছড়া। আবার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়লে বোঝা যায় এটা কার ছড়া।

একশো দুশো পাঁচশো বছর আগে সীরিয়াস কবি লেখকরা ছড়া লিখতেন না, যারা ছড়া বানাতো— মেয়েরা চাষীরা শিশুরা— তাদের নাম কেউ জানে না। আজ সীরিয়াস লোকেরাও ছড়া লিখছেন। ছড়ার মধ্যে সত্যি কিছু না থাকলে এটা হত না। তবে সব ছড়াই তো আর ছড়া নয়, বেশীর ভাগই পদ্য।

১৯৮০

"লণ্ডন ফগ্"

ফগ্ কথাটার মানে
সত্যি ক'জন জানে
ডিক্সেনারী দেখে
জানতে যদি চাও
লণ্ডন্‌মে আও
শেখো একবার ঠেকে।
ঘর থেকে আজ বেরিয়ে
দেখি বিষম দেরি এ
ক্লাস কামাই'র জোগাড়।
পাঁচটি মিনিট ছুটে
টিউব ট্রেনে উঠে
শেষ হলো কি ভোগার ?
টিউব কাকে বলে ?
মাটির নীচে চলে
সুড়ং পথের রেল।
আওয়াজটা তার অতি !
কিবা চঞ্চল গতি !
কোথা পাঞ্জাব মেল !
মিনিট কুড়ি পরে
এস্ক্যালেটর চড়ে'—
("এস্ক্যালেটর কী ?"
নাগরদোলার মতো
ঘুরছে অবিরত
সিঁড়ির মতনটি।)

— স্টেশন ছেড়ে দেখি
ও মা ব্যাপার এ কী।
অমাবস্যার আঁধার।
যে দিক পানে চাই।
পথ খুঁজে না পাই,
ডান ধার কি বাঁ ধার।
ইলেকট্রিকের বাতি
তারার মতো ভাতি
মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে !
বিশ্বগ্রাসী ধোঁয়ায়
কী যে চোখে ছোঁয়ায়
চোখ ভরে যায় জলে !
সামলে চলি ধীরে
চরম দুর্গতি রে
আচম্‌কা খাই ঠেলা।
অচিন্ লোকের সাথে
ফুটপাথে ফুটপাথে
লুকোচুরির খেলা।
পা বাড়াতে ডর
পড়ব কিসের পর
চোখ থাকতে কানা !
দাঁড়িয়ে থাকা দায়
পিছন থেকে হায়
ধাক্কা বাজে নানা।

রাস্তা পারাপার
আজ হবে কি আর
ঐ ধারে মোর কাজ।
পথের মাঝে ভাই
কোন সাহসে যাই
মোটর গাড়ীর মাঝ।
লোকের ভিড়ের ঠেলা
সে একরকম খেলা,—
মার খাই তো মারি।
কিন্তু গাড়ীর মার
ফিরিয়ে দেওয়া ভার
প্রাণ যাবে যে ছাড়ি।

কোনো রকম করে
একটু যদি সরে
আকাশ জোড়া ফগ্
একটু হলে ফরসা
বক্ষে জাগে ভরসা
রক্ত সে টগ্‌বগ্।
তখন আপনা-বাঁচা
সকল ক'টি চাচা
এ ধরে ওর পিছু
দল বেঁধে পথ কেটে
ক্রস করে যায় হেঁটে
ভয় রাখে না কিছু।

১৯২৭

মুখে মুখে জবাব

বল্ দেখি কোন জানোয়ার
লাফ দেয় গাছ থেকে গাছে ?
মনে হয় ল্যাজ দেখে তার
সাপ যেন ডালে ডালে নাচে।
শুনি তোদের অনুমান।
"হনুমান।" "হনুমান।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
দল বেঁধে ডাকাডাকি করে ?
কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া বলে
রাত্তিরে হাঁকাহাঁকি করে।
শুনি তোদের খেয়াল ?
"শেয়াল।" "শেয়াল।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার

খেয়েদেয়ে মোটা হয় খালি!
বেড়া ভেঙে বাগানেতে ঢোকে
ধরে তাকে নিয়ে যায় মালী।
শুনি তোদের হাসি?
"খাসী।" "খাসী।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
ধোপাদের বোঝা বয়ে আনে?
থেকে থেকে বিষম চেঁচায়
যেন আর সয় নাকো প্রাণে।
শুনি তোদের কাঁদা?
"গাধা।" "গাধা।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
জঙ্গলে ঘোরে আড়ে আড়ে?
হরিণকে পেলে ছাড়ে নাকো
গোরুকেও বাগে পেলে মারে।
দেখি তোদের রাগ?
"বাঘ।" "বাঘ।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
জলে থাকে, ডাঙাতেও ঘর
ভয় পেলে হাত পা ও মাথা
টেনে দেয় খোলার ভিতর
দেখি তোদের মচ্ছব?
"কচ্ছপ।" "কচ্ছপ।"

১৯৪৪
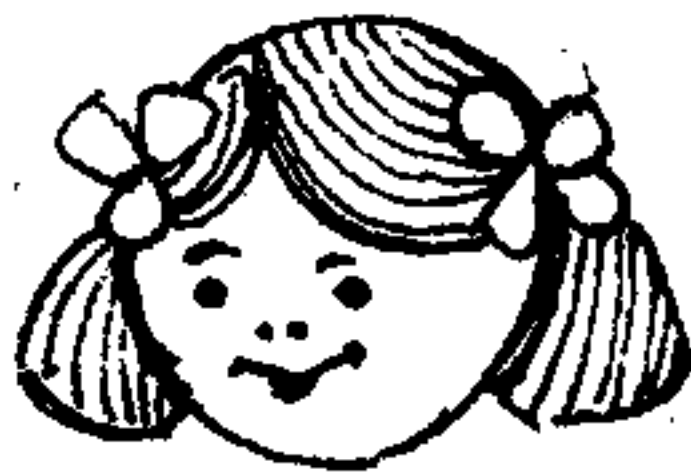
কাঁদুনি

মশায়
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায় !
বাঘ নয় ভালুক নয়
নয়কো জাপানী
বোমা নয় কামান নয়
পিলে কাঁপানী
মশা
ক্ষুদ্র মশা !
মশার কামড় খেয়ে আমার
স্বর্গে যাবার দশা।
মশারি তো মশার অরি
শুনেছি কাহিনী
দুশমনকে দোর খুলে দেয়
পঞ্চম বাহিনী।
একাই জনযুদ্ধ করি
এ হাতে ও হাতে
দুই হাতেরই চাপড় বাজে
নাকের ডগাতে
একাই
মশার কামড় নিজের চাপড়
কেমন করে ঠকাই !

শেষে
ম্যালেরিয়ায় ধরলে আমায়
একেবারে ঠেসে
মশায় !
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।
কেশনগরের মশার সাথে
তুলনা কার চালাই ?
বাঘের গায়ে বসলে মশা
বাঘ বলে সে, "পালাই।"
জাপানীরা ভাগ্‌লে কেন
খবরটা কি রাখেন ?
কেশনগরের মশার মামা
ইম্ফলেতে থাকেন।
পলাশির সেই লড়াই যদি
কেশনগরে ঘটত
কেশনগরের মশার ঠেলায়
ক্লাইভ সেদিন হটত।
মশা
তুচ্ছ মশা
মশার জ্বালায় সেদিন হতো
ডানকার্কের দশা

মশায় !
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায় !

১৯৪৫

হাভাতে

শুদ্ধোদন দাশগুপ্ত
শুদ্ধোদন দাশগুপ্
ঘরের কোণে বসে আছো
কেন অমন চাপচুপ !

হায় রে আমার পোড়া কপাল
হায় রে আমার পোড়া কপ্।
হোটেল থেকে দিয়ে গেল
গণ্ডা কয়েক মাটন চপ্।

বেড়াল এসে খেয়ে গেল
খপাখপ গপাগপ।
হায় রে আমার পোড়া কপাল
হায় রে আমার পোড়া কপ্।

১৯৫৫

ভেল্‌কি

চণ্ডীচরণ দাস ছিল
পড়তে পড়তে হাসছিল।
হাসতে হাসতে হাঁস হলো
হায় কী সর্বনাশ হলো !

বিশ্বমোহন বল ছিল
ঘাসের উপর চলছিল।
চলতে চলতে ঘাস হলো
হায় কী সর্বনাশ হলো !

নন্দগোপাল কর ছিল
ডুব দিয়ে মাছ ধরছিল।
ধরতে ধরতে মাছ হলো
হায় কী সর্বনাশ হলো !

বন্দে আলি খান্ ছিল
গাছের ডাল ভাঙ্ছিল।
ভাঙ্তে ভাঙ্তে গাছ হলো
হায় কী সর্বনাশ হলো !

১৯৫০

বাতাসিয়া লুপ

ছ'টা কুড়ি
ট্রেন ছেড়েছে শিলিগুড়ি।
ডিং ডং
ছাড়িয়ে গেল কার্সিয়ং।
ঝুম ঝুম
এবার বুঝি এলো ঘুম।
টিং টিং
ঘুম থেকে যায় দার্জিলিং।
ইয়া ইয়া
এই কি সেই বাতাসিয়া ?
চুপ চুপ
সামনে বাতাসিয়া লুপ।
নমো নমো
বিশ্ব মাঝে উচ্চতম।

বেঁকে বেঁকে
ট্রেন চলেছে বৃত্ত এঁকে।
ঘুরে ঘুরে
ট্রেন চলেছে ঘূর্ণি জুড়ে।
ওগো কাকী
ট্রেন কি ঘুমে ফিরল নাকি !
মজা খুব
ট্রেন যে হঠাৎ দিল ডুব।
লাইন তলে
নামতে থাকা লাইন চলে।
ও পারেতে
ট্রেনকে দেখি দৌড়ে যেতে।
টিং টিং
ঐ যে আসে দার্জিলিং ।।

১৯৫৭

পার্সেল

(খোলার আগে)
দিদি লো দিদি
এ কী নিধি
তোর কপালে
মেলায় বিধি !
ছাপ মেরেছে
মার্কিনের
পার্সেলটা
বড় দিনের।
দাঁড়িয়ে আছে
ডাক পিয়ন
ছাড়িয়ে নিতে
লাগবে পণ।
(খোলার পরে)
ও দিদি তুই
বেশ মেয়ে !
সাগর পারের
কেক পেয়ে
কোথায় রে তোর
মুখে জল ?
দেখছি যে তোর
চোখে জল !
পড়ছে মনে
ওখানকার

বন্ধুজনের
স্নেহের ধার ?
(দিদির উক্তি)
এইটুকু এই
কেক এলো
চোখের মাথা
কে খেলো !
মুখপোড়াদের
কার্য
পাঁচটি টাকা
ধার্য !
পাঁচটা টাকার
মাল না
তিলকে করে
তাল না !
কেকটাকে কর
ন'কুচি
মাশুল ঘরের
নিকুচি।
কুচিকে কর
ফ্যাঁকড়া
মাশুলবাবু
ড্যাকরা।
পাড়াতে দে
হরির লুট
ভগ্নী পতের
পকেট লুট।

১৯৫৫

যেখানে বাঘের ভয়

(এই ব্যালাড জাতীয় কবিতাটি ঠিকমতো পড়তে হলে কোনখানে কোনখানে থামতে হবে ও কোনখানে ছুটতে হবে তার একটা ইঙ্গিত নিচে দিচ্ছি।

এক যে...ছিল রাজা দেয় না সাজা...লোকটি...ভালো বেজায় একদা...ঘোর বনেতে নির্জনেতে...থাকবে...বলে সে যায়।)

এক যে ছিল রাজা
এক যে ছিল রাজা দেয় না সাজা লোকটি ভালো বেজায়
একদা ঘোর বনেতে নির্জনেতে থাকবে বলে সে যায়।
তার পর খবর নেই
তার পর খবর নেই ব্যাপার এই রানীকে ভাবিয়ে তোলে
তা শুনে উজীর বুড়ো নাজীর খুড়ো পড়ল গণ্ডগোলে।

রাজাদের অশ্বশালায়
রাজাদের অশ্বশালায় সন্ধানে যায় আছে কি তাজী ঘোড়া ?
সে ঘোড়া চড়তে জোয়ান কে আগুয়ান পাবে তোড়া।

একটা ছিল বাজী
একটা ছিল বাজী আরবী তাজী চেহারা বেবাক সাদা
সে ঘোড়ার লায়েক সোয়ার মেলা যে ভার। চড়লে পড়বে, দাদা।।

তা ছাড়া বাঘের ডরে
তা ছাড়া বাঘের ডরে দিন দুপুরে সে পথে চলতে মানা
তাই তো হয় না জোয়ান কেউ আগুয়ান, করে সব টালবাহানা!
ছিল এক বিশ্বাসী জন

ছিল এক বিশ্বাসী জন রাজার আপন, সে বলে, আচ্ছা, রাজী
বাঁচি বা পড়ি মরি ঘোড়ায় চড়ি কেয়াবাৎ আরবী তাজী।
সেকালে হয়নি বাইক
সেকালে হয়নি বাইক ছুটল পাইক ঘোড়াতে টগবগিয়ে
দু'ধারে রইল খাড়া দেখল যারা নীরবে হকচকিয়ে।

চলল বায়ুরথে

চলল বায়ুরথে বনের পথে চলল জোর কদমে
সন্ধ্যা হবার আগে এড়িয়ে বাঘে থামবে একটি দমে।

ঘোড়াটি সত্যি খাসা

ঘোড়াটি সত্যি খাসা মুখের ভাষা শুনলে সমঝ করে
ছোটে সে রাজার কাজে বনের মাঝে ভাগে না বাঘের ডরে।
তখনো হয়নি বিকাল

তখনো হয়নি বিকাল হেন কাল পিছনে ডাকল কেটা।
আঁশটে গন্ধ ও কার! কেবা আর! সাক্ষাৎ যমের বেটা!

এক বার পিছন ফিরে
এক বার পিছন ফিরে সে মূর্তিরে অদূরে দেখতে পেয়ে
সোয়ারি প্রাণের দায়ে ঘোড়ার গায়ে চাবকায়, চলে ধেয়ে।

দৌড়ে বাঘের সাথে

দৌড়ে বাঘের সাথে কম তফাতে ঘোড়া সে পারবে কত।
ছুটতে বনবাদাড়ে কাঁটার মারে পায়ে তার হাজার ক্ষত।
পাছাতে বসল কামড়
পাছাতে বসল কামড় এরপর ঘোড়া কি চলতে পারে!
সোয়ারি হাত নাগালে গাছের ডালে সবেগে লম্ফ মারে।

হায় হায় ঘোড়া গেল!
হায় হায় ঘোড়া গেল বাঘে খেলো কামড়ে একটা কিনার
বাকীটা রইল পড়ে খাবে পরে রাত্রেই বাঘের ডিনার।

বাঘটা ধীরে ধীরে
বাঘটা ধীরে ধীরে চলল ফিরে কোথা যে গভীর বনে
ক্রমে তার গন্ধটাও হয় উধাও ভয় আর নাইকো মনে।

মাটিতে নামল পাইক
মাটিতে নামল পাইক চারদিক যতনে রাখল দেখে
তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে রাজার পাশে ছুটল এঁকে বেঁকে।

কাছেই বানর পাহাড়
কাছেই বানর পাহাড় উপরে তার উঠল হামা দিয়ে
দেখল রাজা মশায় ধ্যানধারণায় মশগুল ঠাকুর নিয়ে।
পড়ল চরণ ধরে

পড়ল চরণ ধরে নিরুত্তরে রইল একুশ মিনিট
রাজা তো প্রশ্ন করে ভেবে মরে লোকটা হলো কি ফিট!

শেষটা গেল জানা
শেষটা গেল জানা বাঘের হানা আহাহা ঘোড়ার মরণ!
মহারাজ ভীষণ ক্ষেপে রাগে কেঁপে ছাড়িয়ে নিলেন চরণ!

বন্দুক তৈরি ছিল
বন্দুক তৈরি ছিল কাঁধে নিল বলল, বাঘটা কোথায়?
বাঘ কি কলে গাছে ধারে কাছে চাইলে বাঘ দেখা যায়।

সামনে চলল পাইক

সামনে চলল পাইক ঠিক ঠিক চলল বনের দেশে।
সেই যে গাছের গোড়া যেথায় ঘোড়া সেখানে থামল এসে।

আহাহা আরবী তাজী!
আহাহা আরবী তাজী খোশমেজাজী একে যে ধরল বাঘা
সে বাঘে দেখতে পেলে অবহেলে হবে আজ গুলী দাগা।

বুনোরা এলো ছুটে
বুনোরা এলো ছুটে সবাই জুটে বাঁধল বাঁশের মাচান
চার দিক রইল ছিপে টিপে টিপে চুপচাপ রাজা যা চান।

চাঁদনী অর্ধরাতে
চাঁদনী অর্ধরাতে গন্ধে মাতে নিঃঝুম অর্ধযোজন
বাঘটা ঘোড়ার খোঁজে ওই এলো যে সারতে নৈশ ভোজন,

তাক করে ছুটল গুলী
তাক করে ছুটল গুলী মাথার খুলি বাঘটা গর্জে ওঠে
হৈ চৈ করে সবাই বুনো ক'ভাই বাঘটা বন্দী গোঠে।

গুড় গুড় গুড়ুম গুড়ুম
গুড় গুড় গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম
বার দুই বাজল আওয়াজ
বাঘ বীর পড়ল ভূঁয়ে মাথা নুয়ে থামলেন রাজাধিরাজ।

১৯৫৪

কলম কিনি কেন ?

কলম কিনি চোরকে দিতে
চোর যে আমার প্রাণের মিতে।
বুক পকেটে পাঞ্জাবিতে
কলম রাখি চোরকে দিতে।
কতক্ষণ বা লাগে নিতে
চোর যে আমার প্রাণের মিতে।

কলম কিনি মাসে মাসে
বিলিয়ে আসি ট্রামে বাসে।
খাইনে তাতে কী যায় আসে
কলম কিনি মাসে মাসে।
লোকের ভিড়ে বন্ধ শ্বাসে
বিলিয়ে আসি ট্রামে বাসে।

বন্ধুরা সব বলছে [illegible]তে,
এবার লেখ পেন্‌সিলেতে।
প্রেরণা কি আসবে এতে ?
আমিও তাদের বলছি তেতে।
কলম গেলে দেব যেতে
লিখব নাকো পেন্‌সিলেতে।

১৯৫৮

নাম করতে নেই

ফিরছি সেদিন আঁধার রাতে
টিপবাতিটা জ্বলছে হাতে
হঠাৎ দেখি পায়ের কাছে—
নাম করতে নেই।
এঁকে বেঁকে ডাইনে বামে
খানিক ছোটে খানিক থামে
পথটি আমার জুড়ে থাকে
বেবাক সম্মুখেই।

চিকন কালো ছিপছিপে তার
অঙ্গে দেখি সাদার বাহার
দীঘল তনু লতার মতন
ঘাসের উপর টানা।
আমার বাতির আলোর তীরে
চমকে ওঠে, তাকায় ফিরে
দেখিনে তার ফণা তোলা
হয়তো আলোয় কানা।

হাতে আমার ছিল ছাতা,
মারতে আমি তুলি না তা
ডাকি নাকো পাড়ার লোকে
তবুও তারা আসে।
চাচারা সব থাকে তফাৎ
মারতে তাদের ওঠে না হাত
"অনিষ্ট তো করেনি ও"
বিজ্ঞসম ভাষে।

তখন আমি হেসে বলি,
"সেও চলুক আমিও চলি
কাজ কী মেরে? কাজ কী মরে?
যে যার ঘরে যাই।"
মিশকালো তার অঙ্গটারে
মিশতে দিই অন্ধকারে
মাঠের পথে বাতি জ্বেলে
জোরে পা চালাই।

১৯৬০

ফলার

কী খেয়েছ? কী খেয়েছ?
বল আমায় সত্য।

আর তো কিছুই যায় না পাওয়া
তাই খেয়েছি আজব খাওয়া
মা ঠাকুমার রেখে যাওয়া
কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

খেলে কিসে? খেলে কিসে?
বল আমার খাঁটি।

বাসন যত ছিল ঘরে
বিকিয়ে গেছে ওজন দরে
বন্ধ ছিল সাত পুরুষের
সোনার পাথরবাটি।

১৯৬৫

ভাগ্য

রবিবারে জন্মায়
কবি বলে যশ পায়।
সোমবারে জন্ম
তার হয় ধন্ম।
মঙ্গলবারে জাত
বীর বলে বিখ্যাত।
জন্ম কি বুধবার?

বুদ্ধিটি ক্ষুরধার।
বৃহস্পতিবারে জাত
বিদ্বান বলে খ্যাত।
জন্ম শুক্কুরবার
আলো করে রূপে তার।
শনিবারে জন্মায়
ধনী হয়ে মান পায়।

১৯৭৩

হবুচন্দ্র রাজার

হবুচন্দ্র রাজার ছিল
হাতী হাজার হাজার ছিল
ঘোড়া হাজার হাজার ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।
হবুগঞ্জ বাজার ছিল
দোকান হাজার হাজার ছিল
পসার হাজার হাজার ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।
গবুচন্দ্র ওয়াজির ছিল
নবুচন্দ্র নাজির ছিল
অবুচন্দ্র কাজী ছিল।
হবুচন্দ্র রাজার।
মোটা লোকের সাজা ছিল
রোগা লোকের খাজা ছিল
প্রজারা সব তাজা ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।
পাই পয়সা খাজনা ছিল
দুধভাত মাগ্‌না ছিল
ঘাম ঝরানো মানা ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।

হিংসুটে

পিসী, তুমি মাসী কেন হবে?
তোমায় ওরা ডাকছে কেন মাসী?
পিসী, তুমি ওদের মাসী হলে
কেমন করে তোমায় ভালোবাসি!
হিংসুটে!
সবাই ওরা হিংসুটে
আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না!
পিসী তুমি, নও মাসী।
পিসী, তুমি মামী কেন হবে!
তোমায় ওরা ডাকছে কেন মামী?
পিসী, তুমি ওদের মামী হলে
কেমন করে ভালোবাসি আমি!
হিংসুটে!
সবাই ওরা হিংসুটে
আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না!
পিসী তুমি, নও মামী।

পিসী, তুমি কাকী কেন হবে ?
তোমায় ওরা ডাকছে কেন কাকী !
পিসী, তুমি ওদের কাকী হলে
কেমন করে পিসী বলে ডাকি।
হিংসুটে !
সবাই ওরা হিংসুটে
আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না !
পিসী তুমি, নও কাকী।

১৯৭৪

আহা কী রান্না

ধন্য মেয়ের হাতের গুণ
রান্নাতে দেয় দু'বার নুন।
তাই তো বলি, মা মণি
ডাকব নাকি লাবণী ?

বৌমা আমার আদরিণী
যা রাঁধবেন তাতেই চিনি।
তাই তো বলি, বৌমা
ডাকব নাকি মৌমা !

ইঁদুরছানার কাণ্ড

ইঁদুরছানা দিচ্ছে হানা
পাণ্ডুলিপি ছিন্ন
এখন আমার উপায় কী আর
বেড়াল পোষা ভিন্ন ?
বেড়াল যদি পুষি তাকে
কে যোগাবে মৎস্য

মাছের বাজার আগুন বলে
মাছ খাইনে, বৎস।
বিন্দি কুকুর বৃদ্ধ এখন
আর পারে না ধরতে
তোমরা কি চাও আমিই যাব
ইঁদুরছানার গর্তে ?

১৯৭৮

রণ-পা

হাইলে হুপি! হাইলে হুপি!
বলছি শোনো চুপি চুপি।

মন লাগে না লেখাপড়ায়
মন উড়ে যায় রণ-পা চড়ায়।

রণ-পা চড়ি খেলার মাঠে
রণ-পা চড়ি পথে ঘাটে।

রণ-পা চড়ি দিনের আলোয়
রণ-পা চড়ি রাতের কালোয়।

তাকায় লোকে ডাকাত নাকি!
চেঁচিয়ে করে ডাকাডাকি।

দৌড়ে কি কেউ ধরতে পারে
ছাড়িয়ে যাই মোটরকারে।

সেই যে আমার রণ-পা জোড়া
সেই তো আমার রেসের ঘোড়া।

শোবার আগে খাটের তলে
অশ্ব রাখি আস্তাবলে।

সকালবেলা জেগে দেখি
অশ্ব কই! ব্যাপার এ কী!

ধমক লাগান ছোটকাকা
চলবে নাকো রণ-পা রাখা!

পুলিশ এসে নিত্য শুধায়
চোরাই মাল আছে কোথায়?

চোর নাকি রে! ডাকাত নাকি!
পড়বে হাতে হাতকড়া কি?

হাইলে হুপি! হাইলে হুপি!
বলছি শোনো চুপি চুপি।

ক্ষান্ত হয়ে রণ-পা চড়ায়
মন দিয়েছে লেখাপড়ায়।

১৯৮২

জনরব

প্রথম দৃশ্য (রেলস্টেশন)

[সত্যচরণ মুস্তফী মাল গুনতি করছেন, এমন সময় শম্ভুচরণ দে এলেন।]

শম্ভু। ইস্টিশনে করছ কী
সত্যচরণ মুস্তফী ?

সত্য। আরে, কে ?
শম্ভু দে ?
যাচ্ছি ভাই
বেগুসরাই।

শম্ভু। বেগুসরাই!
বেগুসরাই!
হঠাৎ কেন
ইচ্ছা হেন ?

সত্য। লোকের মুখে শুনছি, ওমা
কলকাতায় পড়ছে বোমা।
পড়ল যদি কলকাতায়
পড়বে না কি গড়বেতায় ?

শম্ভু। তাই নাকি হে তাই নাকি
আমিও কেন রই বাকী ?
পড়ল যদি গড়বেতায়
পড়বে না কি বাঁকুড়ায় ?

সত্য। সেই কথাটাই বলল কালু মিস্তিরি
তাই না শুনে কাঁদল আমার ইস্তিরি
পালিয়ে এলুম কাচ্চাবাচ্চা সব নিয়ে
কোনোমতে কাছাকোঁছা সামলিয়ে।

শম্ভু। আমিও তবে সরে পড়ি
যোগাড় করি টাকাকড়ি।
যেতে হবে জামতাড়া
সাথে নেই রেলভাড়া।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য (রাস্তা)

[শম্ভুচরণ দে ছুটছে। কুঞ্জ পাল উল্টো দিক থেকে আসছে।]

কুঞ্জ। হন্‌হনিয়ে যাচ্ছে কে?
শম্ভু দে?
ছুটছ কেন ল্যাজ তুলে
বলো আমায় মন খুলে।

শম্ভু। বলব কী, ভাই কুঞ্জ পাল
দেখবে চোখে আপনি কাল!
বাঁকুড়াতে পৌষ মাস
গড়বেতায় সর্বনাশ।

কুঞ্জ। গড়বেতায়! গড়বেতায়!
কী হয়েছে গড়বেতায়!

শম্ভু। কী হয়েছে দেখো গে
ইস্টিশনে থেকো গে।
আসছি আমি এক ছুটে
ভাই ভাইপো সব জুটে।
পথ ছেড়ে দাও, ছাড়বে না?
শোন তবে......বোম......বোমা। (প্রস্থান)

কুঞ্জ। বাপ রে বাপ! দিলুম ফাঁক।
বাসায় গিয়ে পোঁটলা নিয়ে
ভাগব দূরে ভাগলপুরে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য (মাঠ)

[রাখাল গরু চরাচ্ছে। কুঞ্জ পাল দৌড়াচ্ছে।]

রাখাল। অমন করে লাফায় কেটা?
পালের বেটা?

কুঞ্জ। দেখেছিস কী? ওরে ও
ঘোষের পো।
আনতে হবে মস্ত মোট
আয় রে, ওঠ!
ইস্টিশনে পৌঁছে দে
পয়সা নে।

রাখাল। কী হয়েছে, বল না ?
করছ কেন ছলনা ?

কুঞ্জ। মাথায় তোর গোবর
শুনিস্ নি সে খবর ?
গড়বেতায় বোমা.......

রাখাল। ওমা.......(মূর্ছা গেল)

পুলিশ। (প্রবেশ করল)
ক্যা কিয়া তোম, খুন কিয়া ?
মৎ যাও তোম, জান লিয়া।

কুঞ্জ। দোহাই হুজুর। পুলিশম্যান।
আমার উপর চটেন ক্যান ?
গড়বেতায় পড়ল বোম্.......

পুলিশ। ক্যায়সা বাত বোলতা তোম!

কুঞ্জ। সত্য কথা বলছি, জী
ইস্টিশনে চলছি, জী

পুলিশ। আরে বাপ রে চাচ্চা রে
এ বাত তব সাচ্চা রে।
হাম যাতেহেঁ দেশ। (বিদায়)

কুঞ্জ। বেশ, সিপাহী, বেশ।
ইস্টিশনে থামিও। (প্রস্থান)

রাখাল। (উঠে বলছে) পালাই তবে আমিও। (দৌড়)

চতুর্থ দৃশ্য (রাস্তা)

[রাখাল গোরু-বাছুর ছাগল নিয়ে যাচ্ছে। ভূতনাথ বাগ্‌দী দেখে বলছে]

ভূতনাথ। গোরু বাছুর ছাগল নিয়ে
চলল কোথায় ? পাগল কি এ!

রাখাল। পাগল নয় গো ঘোষের পুত
বুঝবি কী তুই, বাগ্‌দী ভূত!

ভূতনাথ। ভূতনাথ বাগদী সাক্ষাৎ বাঘ
ছাগল দেখলে তার জাগে অনুরাগ।
(ছাগল ধরে টান)

রাখাল। ও কী রে! ও কী রে! তুই ও কী করছিস।

ছাগলটা মিছিমিছি কেন ধরছিস!
মরি আর বাঁচি আমি যাবই যে রাঁচি
মালগাড়ী চড়ে এরা রবে কাছাকাছি।

ভূতনাথ। রাঁচিতে পাগলে যায়, যায় ছাগলে কি?
ছেড়ে দে, আমার পেটে যায় কি না দেখি।

রাখাল। ওরে ভাই ভূতনাথ তোরে করি প্রণিপাত
সময় যে নাই আর সময় যে নাইরে।
রেলগাড়ী দাঁড়াবে না, হবে না টিকিট কেনা
বোমা খেয়ে মারা যাব ভূতনাথ ভাই রে।

ভূতনাথ। বোমা!.......

রাখাল। শুনিসনি.......

ভূতনাথ। ......বোমা!

রাখাল। ....পালা!

ভূতনাথ। ওরে ভাই ঘোষ রে।
ধরিস্‌নে দোষ রে।
আগে যদি যাস্ তুই করিস্ টিকিট
ট্রেনটাকে আটকাস্ পাঁচটি মিনিট।

পঞ্চম দৃশ্য (স্টেশন। টিকিট ঘর)

[টিকিটবাবু ঘুম দিচ্ছেন। লোকজন ডাকাডাকি করছে।]

—বাবুমশাই, টিকিট।
—বাবুসাহেব, টিকিট।
—এ-বাবুজী, টিকিট।
—বড়বাবু, টিকিট।
—বড় সাহেব, টিকিট।
—বড় হাকিম্, টিকিট।
—জং বাহাদুর, টিকিট।
—নবাব বাহাদুর, টিকিট।
—রাজা বাহাদুর, টিকিট।
—হুজুর বাদশা, টিকিট।

—কিং এমপেরর, টিকিট।

—গড অলমাইটি, টিকিট।

টিকিটবাবু। (দাঁত খিঁচিয়ে)

কেন এত গোলমাল!

যত সব বোলচাল।

সাড়ে চার ঘন্টা

লেট আজ ট্রেনটা। (আবার ঘুম)

১৯৪২

ছাগ-চরিত

বাড়ীতে দুটি মানুষ—আমার বন্ধু ও আমি। বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। ভাবি একটি কুকুর পুষলে কেমন হয়। কিন্তু ছোটবেলায় আমার পোষা কুকুর হঠাৎ পাগল হয়ে আমাকে কামড়ে দিয়েছিল।

তারপর লণ্ডনের সেই যে পোষা কুকুর 'ম্যাক্স'—যাকে নিয়ে অবসর সময়টাতে নানা আমোদ করা যেত—একদিন সকালবেলা তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। হতভাগাটার একটা বদ্ স্বভাব ছিল—যে তাকে আদর করে ডাকত, তারই সঙ্গে সে বোকার মত ছুটত। খুব সম্ভব কোন কুকুর-চোর তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। আমরা কত বিজ্ঞাপন দিলুম, কতদিন ও কতরাত তার পথ চেয়ে রইলুম, কতবার পরের কুকুরের গলার সুর শুনে লাফ দিয়ে উঠলুম, ভাবলুম, "ঐ যে ম্যাক্স এসেছে।"

অবশেষে একজন বল্লেন, লণ্ডনের একটি গুপ্ত স্থানে চোরাই কুকুর সস্তায় বিক্রী হয়। তিনি ঠিকানা দিলেন। সেখানেও ম্যাক্সকে বিক্রী হতে দেখা গেল না। তখন আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললুম, "যাক্, মরে তো যায় নি মোটর চাপা পড়ে। মরলে সে খবর চাপা পড়ত না। ম্যাক্স যেখানেই থাকুক, বেঁচে থাকুক।"

এই ঘটনার পর আর কুকুর পুষতে কার সাধ যায়, বলো। অথচ কিছু একটা পুষতে ইচ্ছা করে। বেঁজি কিম্বা বাঁদর পুষবো কিনা ভাবছি, একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে দেখি উঠানে এক কালো রঙের ছাগল বাঁধা রয়েছে।

আবু নামক আমাদের যে কনোজিয়া ব্রাহ্মণ পাচকটি ছিল সে গদ গদ ভাবে বললে, "হুজুর, এহি বক্‌রীকো এক আদমী ভুলাকে লে যাতা থা।"

আবুর বিশুদ্ধ মুর্শিদাবাদী উর্দু শুনলে তোমরাও উর্দু ভাষায় মৌলবী হতে পারতে, কিন্তু সে সুযোগ তো পাওনি, তাই ওর উর্দু বক্তৃতার বাংলা সারাংশ দিই।

ছাগলটাকে কে একটা লোক ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দেখে আবুর মনে সন্দেহ হয়। আবু বলে, "এ বক্‌রী তুমার হোতে পারে না। তুমি ইকে সাথে লিয়ে যাচ্ছো কেনে ?"

লোকটা ভয় পেয়ে ছাগলকে ছেড়ে দৌড় দিয়ে বাঁচল। আবু মিঞা সেটিকে সযত্নে বেঁধে তার সুমুখে কিছু ঘাস রেখে দিয়ে রান্নাঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন। সম্ভবত সেটিকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দান করতেন এবং দিন কয়েক পরে আমাদের টেবিলের উপর পরিবেশন করতেন, কিন্তু রান্না ফেলে রেখে বাড়ী গেলে তাঁর চাকরি থাকত না। সম্ভবত তিনি ধরে রেখেছিলেন যে আমরা তাঁর বাহাদুরির তারিফ করে ছাগলটি তাঁকেই দিয়ে দেবো।

আমি ভাবছিলুম, ছাগল পুষলে তো মন্দ হয় না। খরচ কিছুই হয় না। ঘাস,

কাগজ, ইট, কাঠ, হামামদিস্তা সবই তো ছাগলের খাদ্য। এক জায়গায় বেঁধে রেখে আমার ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের অসংখ্য ছেঁড়া চিঠি তার সামনে ঢেলে দিলে দেশলাই খরচটাও বাঁচবে।

কিন্তু না জানি কোন গরীবের চোখের মণি এই ছাগল। আমরা তাকে বঞ্চিত করতে চাই নে। আমরা কাল সকালে এই ছাগল থানায় পাঠিয়ে দেবো। তবে এই নধর প্রাণীটিকে এর মালিকের হাতে পৌঁছে দেবে কি নিজেদের উদরে পৌঁছে দেবে সে বিষয়ে সংশয় জাগছিল। খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দিলে হয়তো গরীবের দু'পয়সা লোকসান হবে, তবু ছাগলটিকে তো আস্ত পাবে।

আবুকে বললুম, ''কাল ইস্‌কো পাউণ্ড্‌মে জরুর ভেজ দেনা। জিস্‌কী বক্‌রী উও ছোড়ুআ লেগা।''

এই দেখ, আমিও উর্দু বিদ্যায় আবুর দোসর।

আবু ক্ষুণ্ণ হলো। প্রতিবাদ করল না। আমাদের আহারাদির পরে ছাগলটির প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করতে করতে খাবার উদ্যোগ করল। এই সময় ছাগকণ্ঠের ভাষা প্রথম শুনলুম—''ব্যা।''

আবু বলল, ''ও কিছু নয়। আপনি ওকে ঐখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র বাঁধতে যাচ্ছেন বলে ও আপত্তি জানাচ্ছে। ছাগলদের সহজেই একটা জায়গার উপর মায়া পড়ে যায়।''

আবু তার বাড়ী চলে গেল। বন্ধু গেলেন নিজের ঘরে ঘুমতে। আমি ঘুমুই উঠানের দিকে দরজা খোলা রেখে, তারাময়ী নিশীথের প্রায় নিয়ে। একটু তন্দ্রার ঘোর লেগেছে। অন্ধকার রাত্রি, হঠাৎ ছাগলটার চীৎকার শুনে চোখ মেলে দেখলুম তার আশে পাশে একটা শেয়াল। ছাগলের মতো সর্বজনপ্রিয় প্রাণী কোথা থেকে এক শেয়ালকেও আকর্ষণ করে এনেছে।

অগত্যা উঠতে হলো। হুঙ্কার দিয়ে শেয়ালকে তাড়া করে নিয়ে গেলুম। শেয়ালটা টের পাক্ যে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর প্রাণী ভূ-ভারতে আছে।

এদিকে ছাগলটা সেই যে ''ব্যা''—''ব্যা—'' করা শুরু করল, যতই তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে অভয় দিই কিছুতেই থামে না। তার কাছ থেকে দু'হাত দূরে গেলে তার সুর সপ্তমে ওঠে। নিজের হাতে সেই অন্ধকার রাত্রে বাগান থেকে ঘাস তুলে আনি। খায় না। শুধু ডাকে ''ব্যা—আ'', ''ব্যা—আ'', ''অর্‌র্'', ''বর্‌র্।'' অল্প সময়ের মধ্যে আমি ছাগ ভাষাবিদ্ পণ্ডিত হয়ে উঠলুম।

তখন বোধ করি বারোটা বাজে। ছাগলটাকে ওখান থেকে খুলে নিয়ে এমন জায়গায় বাঁধলুম যেখান থেকে আমার বিছানা বেশী দূরে নয়। শেয়ালে ধরলে ছাগলের চীৎকারে চট্ ক'রে আমার ঘুম ভেঙে যাবে। কিন্তু তাতেও ফল হলো না। আমার বিছানার দিকে পা না বাড়াতেই ছাগলটা ''ব্যা''—ব'লে কেঁদে ফেলে।

শেষকালে সেটাকে নিয়ে আমার খাটের পায়ায় বাঁধলুম। ভাবলুম এবার সেও ঘুমোবে, আমাকেও ঘুমোতে দেবে। শেয়াল মশাইও সাহস করে এত দূর এগোবেন না। মিনিট কয়েক তার চীৎকারটা থামল। ঘুম আমার চোখে সেই সুযোগে নামল। অমনি খাটের নিচে থেকে ফিস্ করে কে বলল, "ব্যা—।"

আমি বললুম "চুপ!"

সে আর একটু উঁচু গলায় বলল, "ব্যা—আ।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, "ব্যা—আ।"

তখন দু'জনে মিলে পাল্লা দিয়ে কিছুক্ষণ "ব্যা—" করা চলল। ভেবেছিলুম ছাগলটা হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করবে। কিন্তু সে তেমন জানোয়ারই নয়। সে চার পায়ের হাই হীল জুতো দিয়ে মেমসাহেবদের মত খট্ খট্ করে খাটের নিচের মেজের উপর পায়চারি করা শুরু করে দিল। ছাগকণ্ঠের আর্তরব একবার আমার মাথার দিকে আসে, একবার আমার পায়ের দিকে যায়। হতভাগাটা খাটের তলায় টুঁ মারতেও ছাড়ে না।

অকৃতজ্ঞ অবাধ্য অভদ্র ছাগল! ঘুমের মায়া ত্যাগ ক'রে সেটার দুই শিং ধ'রে হিড় হিড় করে টেনে চললুম একটা খালি ঘরে। ইচ্ছা করছিল তাকে কেটে কুটে কাবাব বানিয়ে খাই। কিন্তু হাতের কাছে হাতিয়ার ছিল না এবং কাবাব বানাতে বিস্তর আয়োজন লাগে। তা ছাড়া ঘুমটা যে পেয়েছিল সে আর কী বল্‌ব। প্রায় একটা বাজে।

খালি ঘরে তাকে বন্দী করে ফিরে এলুম। কিন্তু তার সেই ছাত-ফাটানো আয়োজনখানাকে বন্দী করে কার সাধ্য! আমি বিছানায় শুয়ে দুই কান বন্ধ করে থাকলুম। কিন্তু অমন করে থাকলে ঘুম আসবে কেন?

গেলুম আবার সেই ছাগলের কাছে। পাঁচ মিনিট গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলুম। যদি গেট খুলে রাস্তায় ছেড়ে দিই তবে শেয়ালে তাকে ছাড়বে না। অথচ এমন দজ্জাল ছাগলকে এক মুহূর্ত বাড়ীতে রাখতে নেই।

শেষে কী মনে করে তার গলা থেকে দড়ি খুলে নিয়ে তাকে বাগানে ছেড়ে দিলুম। এবার আর সে ডাকল না। সকালে উঠে তাকে বিদায় করে তবে অন্য কথা।

১৯৩৩
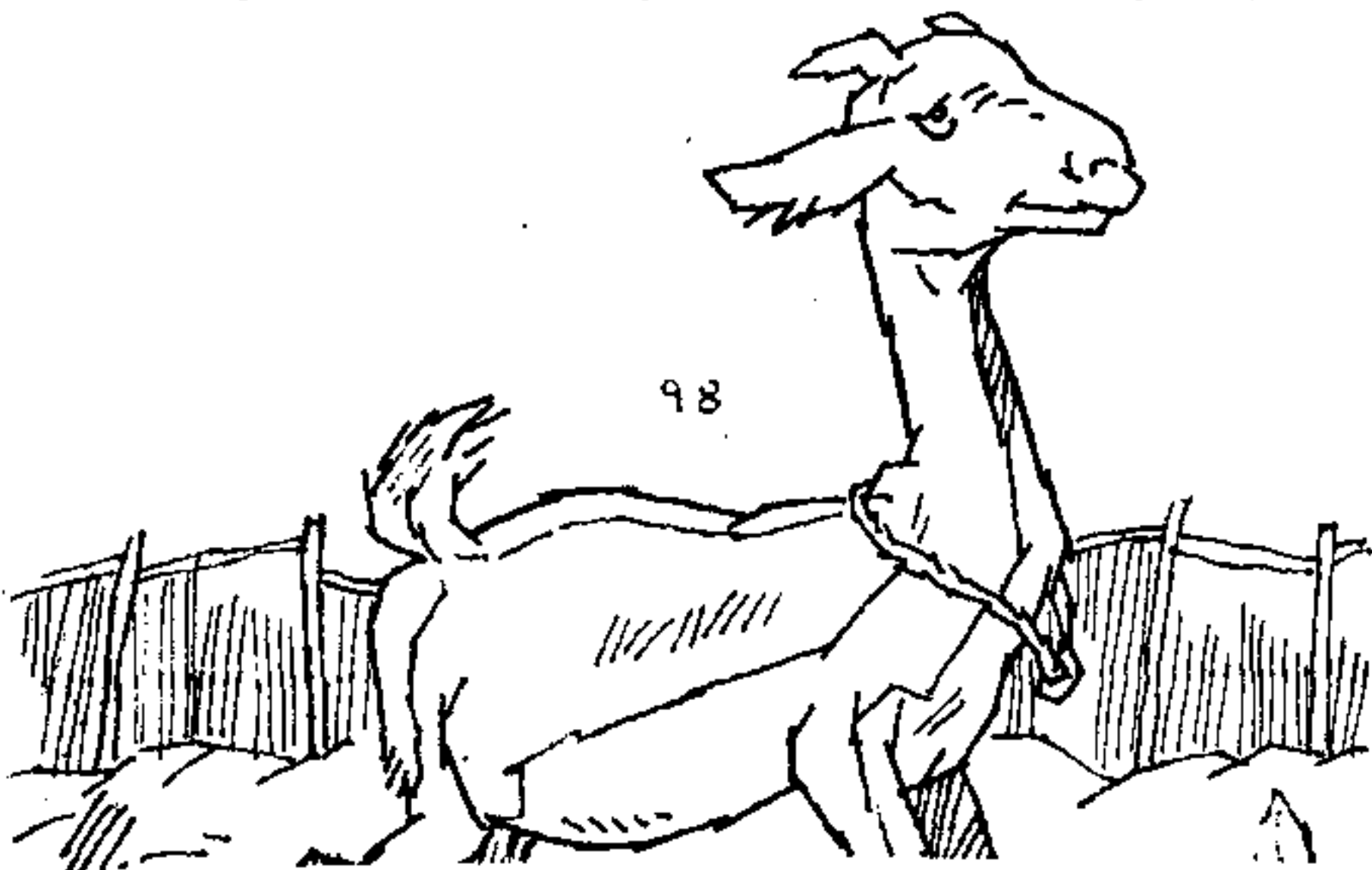
প্রথম চিঠি

ছেলেবেলায় যাদুঘর দেখিনি। আমার চোখে ডাকঘরই ছিল যাদুঘর। বিকেলে যখন আর সবাই যেত ফুটবল খেলতে, আমি ও আমার বন্ধুরা দিতুম ডাকঘরে হাজিরা।

তিন তিনটে রানার পশ্চিমমুখো ছুটে আসত গান গাইতে গাইতে, তাদের পিঠে কাঁঠালের মতো ফলে থাকত ইয়া বড় বড় চিঠির বস্তা, আর পুলকিত হয়ে আমরা ভাবতুম, শুধু কি চিঠি! পার্সেল! তাদের হাতে থাকত চাকার মতো গোল গোল লোহার বালা কি কড়া। দূর থেকে শুনতে পেতুম ঝম ঝম করে বাজছে।

ডাকঘরের ভিতরে ঢুকে তারা কাঁঠাল নামিয়ে দিত আর আমরা ভন ভন করতুম মাছির মতো। যারা একটু দুঃসাহসী তারা ডাকঘরের নিয়ম না মেনে অনধিকার প্রবেশ করত। যদি কোনো বেওয়ারিশ ক্যাটালগ কি মাসিকপত্র এসে থাকে তো আগে থাকতে দখল করত। পোস্ট মাস্টার মশাইরা ছিলেন সাধারণত ভালোমানুষ। কিছু মনে করতেন না। প্রায়ই আমরা যা হোক একটা কিছু হাতে করে ফিরতুম। হয়তো ওষুধের বিজ্ঞাপন। হয়তো নীলামী ইস্তাহার।

বাবার নামে, মা'র নামে চিঠিপত্র থাকলে মাস্টার মশাই আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেন। আমার লোভ ছিল খবরের কাগজখানার উপরে। মোড়ক খুলে একটিবার পড়তুম, তার পরে মোড়কের ভিতর পুরে বাড়ী নিয়ে যেতুম।

আমার এ দুর্বলতার কথা সকলে জানত। যা কেউ জানত না, যা কেউ জানলেও বিশ্বাস করত না, সে কথা আজ বলছি। আমি যে ফুটবল খেলা ফেলে ডাকঘরে হাজিরা দিতুম তা কেবল ক্যাটালগের বা খবরের কাগজের লোভে নয়। আমার আশা ছিল আমার নামেও একদিন চিঠি আসবে। কে যে লিখবে, কোনখান থেকে যে লিখবে, অত ভাবতে পারতুম না। কিন্তু লিখবে নিশ্চয়, খরচ করে টিকিট এঁটে খামে বন্ধ করে নাম ঠিকানা লিখে পাঠাবে নিশ্চয়।

এই আশা আমাকে রোজ টেনে নিয়ে যেত যাদুঘরে। আমার জীবনে ওটা একটা যাদু। ঐ যে চিঠিখানা, যেটা আমার নামে আসবে।

এক দিন আমার স্বপ্ন সত্য হলো। এলো আমার নামে চিঠি। লম্বা একখানা খাম। তার বাঁদিকে একখানা ছবি। ছাপা ছবি। ডান দিকে আমার নাম ঠিকানা। আমাকে অবাক করে দিয়ে মাস্টার মশাই বললেন, "এই নাও, খোকন। তোমার নামে চিঠি।"

আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার নামে চিঠি! আমার কত সাধের, কত আশার চিঠি! আমার শ্রেষ্ঠ চিঠি, আমার সাত রাজার ধন মাণিক চিঠি!

আমি হাত পেতে চিঠিখানি নিতে যাব এমন সময় ওখানি খপ করে কেড়ে নিলে আমার বন্ধু। থাক, তার নাম করব না। ভেবেছিলুম একটিবার দেখে ফেরৎ দেবে।

পরের চিঠি পড়া যে পাপ। কিন্তু সেই যে নিলে আর দেবার নামটি নেই।

"আরে, দে! আরে, দে!" বলে যত তাকে সাধি সে তত শয়তানি করে। তত দূরে পালায়। তার পিছুন পিছুন তার বাড়ী যাই। দেয় না। তার বাপ মাকে বলি, ফল হয় না। কোথায় যে গেল সে চিঠি, আর আমার চোখে পড়ল না। দুঃখ পেলুম।

পরে জেনেছিলুম চিঠিখানার প্রধান আকর্ষণ ছিল তার উপরকার সেই ছবিখানা। ছবিখানা কেটে নিয়ে বাকীটা আমাকে দিলে পারত, কিন্তু যে কাগজে চিঠি লেখা হয়েছিল সেই কাগজটাই ভাঁজ করে খাম তৈরি করা হয়েছিল। খাম ও চিঠি অভিন্ন।

কাজেই ছবি কাটা গেলে চিঠিও কাটা যায়। এ ছাড়া হয়তো আরো এক কারণ ছিল। সেটা ছেলেমানুষী হিংসে। ওর নামে চিঠি এলো না, আমার নামে এলো। এ কি কখনো সত্য হয়। ওর ধারণা চিঠিখানা ওরই পাওনা, যদিও নাম ঠিকানা ওর নয়, আমার। বোধ হয় ঠাওরেছিল ওটাও একটা বিজ্ঞাপন কি ইস্তাহার। নইলে ছবি থাকবে কেন!

কে যে আমাকে চিঠি লিখেছিল, কী যে লিখেছিল, আজো আমার অজানা। এ নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা করেছি। কত রং ফলিয়েছি। মনে মনে কত গল্প ফেঁদেছি। চিঠিখানা যদি হাতে এসে ফস্কে না যেত খুলে পড়তুম নেহাৎ একটা মামুলি চিঠি। পড়িনি বলেই ও চিঠি আজো আমার মনে রয়েছে কী যেন এক রহস্য হয়ে। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে।

১৯৮৫

ছেলেবেলা

আমার ছেলেবেলা কেটেছে বন-জঙ্গল আর পাহাড়ের কোলে। আগে নাকি আমাদের বাড়ী থেকে বাঘের ডাক শোনা যেতো। ক্রমে বন কেটে বসত হয়। কিন্তু শহর ছেড়ে কিছুদূর গেলেই বাঘের গন্ধ পাওয়া যেতো।

আমার বাবা ছিলেন শিকারী। বৈষ্ণব দীক্ষা নেবার আগে, মাঝে মাঝে শিকার করতেন। সেজন্যে বাড়ীতে একটা বন্দুক ছিল।

তখনকার একটা ঘটনা আমার মনে আছে। তখন আমি খুবই ছোট। বয়েস বোধ হয় তিন-চারের বেশী হবে না।

বাড়ীর ছাদে এসে বসেছিল একটা দাঁড়কাক। বিশ্রী চেহারা। কালো কুচকুচে রঙ। ডাকটাও কর্কশ। বোধ হয়, সেটাই ছিল ওর অপরাধ।

আমাদের চাকর প্রথমে দেখতে পায় ওকে। কিন্তু কাউকে কিছু বললো না। বাবার বন্দুকটা নিয়ে গেল চুপি চুপি। কাকটাকে তাক করে গুলি ছুঁড়লো। আর সেই গুলিতেই মারা গেল কাকটা।

আমরা ছুটে গেলুম বন্দুকের শব্দে।

গিয়ে দেখলুম, রক্তমাখা কাকটা পড়ে আছে ছাদের ওপর। আর অনেকগুলি কাক বিলাপ করছে ওকে ঘিরে। তারস্বরে চিৎকার করে যাচ্ছে।

সেই দৃশ্য আমি কোনোদিন ভুলবো না।

কাকটার জন্যে আমার খুব মায়া হয়েছিল। আঘাতও পেয়েছিলুম। মনে প্রশ্ন জেগেছিল, কি দোষ ছিল ঐ কাকটার? নিজের চেহারা আর কণ্ঠস্বরের জন্যেই কি ও মারা পড়লো?

হিংসার বিরুদ্ধে, রক্তপাতের বিরুদ্ধে সেই আমার প্রথম জিজ্ঞাসা— প্রথম জাগরণ।

তারও আগে-পরের কথা বলি।

আমার জন্ম ওড়িশার একটি ছোট্ট দেশীয় রাজ্যে। তার নাম ঢেঙকানাল। খুবই ছোট রাজ্য। তবু ওখানে রাজা ছিল, রাণী ছিল। আর ছিল অফিস আদালত রাজকর্মচারী—সবই।

রাজা ছিলেন অত্যন্ত উদার হৃদয়। শিক্ষিত সজ্জন। সেই জন্যেই তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রদেশের লোক। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। কেউবা শিখ, কেউবা খৃষ্টান। কেউ ব্রাহ্ম, কেউবা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

সেই বয়সে আমি সে পড়াশোনায় খুব মন দিতুম—তা নয়। দিনের পর দিন খেলাধুলা করেছি। কখনো টেনিস, কখনো ব্যাডমিন্টন। কখনো ফুটবল, কখনো ক্রিকেট। কখনো তাস, কখনো গোলোকধাম বা 'ঘোড়দৌড়'।

খুব গাছে চড়তে পারতুম। সকালবেলা গাছে উঠে বসেছি, সন্ধ্যের আগে নামিনি। হয়তো পেয়ারা গাছে উঠে সারাদিন ধরে কেবল পেয়ারা খেয়েছি। কিংবা জাম গাছে উঠে সারাদিন ধরে খেয়েছি কেবলই কালোজাম। দুটো দশটা খেয়ে শখ মিটতো না।

সাঁতার কাটার ব্যাপারেও ছিল ঐ একই রকমের ঝোঁক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটতুম। পাড়ে ওঠার কথা মনেও থাকতো না।

যখন যে কাজে হাত দিতুম, তাতে লেগে থাকাই ছিল আমার স্বভাব।

আমাদের বাড়ীর পেছনেই একঘর বিহারী মুসলমান বাস করতেন। এখনো করেন। চারদিকে হিন্দুর বাড়ী। অথচ মাঝখানে মুসলমানের বাস। এখন হয়তো অনেকের চোখে এটা বিসদৃশ ঠেকবে, কিন্তু তখনকার দিনে আমাদের চোখে তাই ছিল স্বাভাবিক।

ও বাড়ীর ছেলে আবদুল ছিল আমার খেলার সাথী। ওর জ্যাঠতুতো বোন খায়রুন্নেসার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল অল্প বয়সে।

কাছাকাছি একটা বাড়ীতে থাকতেন খোন্দকার সাহেব। তাঁকে আমরা বলতুম, পাঠান মাস্টার।

তিনি ছিলেন হাইস্কুলের শিক্ষক। বাড়ী খুলনা জেলায়। কিন্তু ওঁর স্ত্রী ছিলেন উর্দু-ভাষিণী। আশ্চর্য সরল মানুষ। কথায়বার্তায়, পোষাকে-পরিচ্ছদে মাষ্টার মশাই ছিলেন বাঙালী হিন্দুর মতো। যদ্দূর মনে পড়ে, তাঁর কাঁধে ঝোলানো থাকতো একটা চাদর।

আমার ছেলেবেলার সবচেয়ে কম বয়সের যে ফটোগ্রাফ, সেটিতে আমি বসে আছি মাস্টার মশাইয়ের কোলে।

বাবার বন্ধুদের মধ্যে আতাহার মিঞাকে বেশ মনে আছে।

তাঁর ছিলো প্রকাণ্ড ভুঁড়ি ও দাড়ি। পরনে আচকান পায়জামা। অত্যন্ত দিলদরিয়া ও রসিক প্রকৃতির মানুষ। আমাদের জন্য হালুয়া নিয়ে আসতেন। সে রকম সুস্বাদু হালুয়া আর কখনো খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

আমার বাবা প্রথমে ছিলেন শাক্ত। পরে বৈষ্ণব হয়ে যান। কিন্তু মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মেলামেশা অব্যাহত ছিল। প্রতিবেশী বিহারী মুসলমান বৃদ্ধ ছিলেন, খুবই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। নিজের বাড়ীতে তিনি কোরাণ পড়তেন। বাবা পড়তেন বৈষ্ণব শাস্ত্র।

মাঝে মাঝে দেখতুম, বাবার সঙ্গে তিনি ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে উভয় ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা করছেন।

মহরমের সময়টা ছিল বেশ আনন্দের।

শহরের মুসলমানরা আমাদের বাড়ীতে এসে বাজনা বাজিয়ে খেলা দেখিয়ে যেতো। তাদের সঙ্গে থাকতো হিন্দুরাও।

শিরিয়া নামে একটি ছেলের কথা মনে পড়ে।

মহরমের জৌলুসে সে বাঘ সাজতো। আমি খুব উপভোগ করতুম। ইচ্ছে হতো, আমিও বাঘ সাজি। কিন্তু প্রকাশ্যে সে সাহস হতো না। তখন মনে মনে কতো যে বাঘের নাচ নেচেছি!

আমার ঠাকুরমা মানত করেছিলেন, আমিও একদিন মহরমে লাঠি খেলবো। সে মানত পূর্ণ হয়নি। ভাবতেও অবাক লাগে, দুই ধর্ম কতো কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।

ছেলেবেলায়

আমাদের বাড়ীর সামনেই সদর রাস্তা।

সেই রাস্তা দিয়ে রোজ দু'বেলা যাওয়া আসা করত রাজবাড়ীর জুড়ি গাড়ী। কে যায় ? বড়ো ডাক্তারবাবু। তিনি রাজাসাহেবের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন।

কে যায় ? লেডী ডাক্তার মেমসাহেব। তিনি রানীসাহেবার স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন। ডাক্তারবাবুরা একই ব্যক্তি নন। কয়েক বছর অন্তর একজনের জায়গায় আরেকজন আসেন। কিন্তু লেডী ডাক্তার মিসেস অ্যাণ্ডারসন চিরস্থায়ী। তাঁরই হাতে আমার জন্ম।

তেইশ বছর বয়সে যখন বিলেত যাই তখনও তিনি বিরাজমান, তবে অবসর নিয়েছেন। হাকিম হয়েছেন তাঁর একমাত্র পুত্র। তাঁর স্বামী আবগারী ইনস্পেকটর অ্যাণ্ডারসন সাহেব ততদিনে পরলোকে। সাহেব আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন বাবার সঙ্গে গল্প করতে।

বলা বাহুল্য এঁরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

তখনো মোটরগাড়ী এই দেশীয় রাজ্যটিতে আসেনি। কলকাতায় এসেছে।

একদিন আমরা অবাক হয়ে দেখি যে আমাদের রাজপথে মোটরগাড়ী চলছে। কখনো রাজাসাহেবকে নিয়ে, কখনো পলিটিক্যাল এজেন্টকে নিয়ে। পরে রাজবাড়ীর ডাক্তার ও লেডী ডাক্তারের জন্যেও মোটরের বন্দোবস্ত হয়। তাতে সময় বাঁচে।

কিন্তু জুড়ি গাড়ীর কোচম্যানের আর কাজ থাকে না। ওকে পেনসন দিয়ে বিদায় দেওয়া হয়। ততদিনে ওরও বয়স হয়েছে প্রায় সত্তর বছর। অথচ এমন শরীরের গাঁথুনি যে সত্তর বছর বয়সেও শক্তিমান পুরুষ। তেজী ঘোড়াকেও বাগ মানাতে ওস্তাদ। বিহারী মুসলমান। চাকরি করতে এসে এই রাজ্যেই থেকে গেছে। এই শহরেরই বাসিন্দা। আমাদের বাড়ীর পেছনেই ওদের বাড়ী। বাবার সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল।

একদিন দেখি বাবা ওকে চেয়ারে বসিয়ে ওর সঙ্গে ধর্মচর্চা করছেন। ততদিনে তিনিও অবসর নিয়েছেন। রাজা-সাহেবের অকালমৃত্যুর পর যুবরাজ সিংহাসন পান, কিন্তু রাজ্যের ভার পান আরো পরে। জমানা বদলে যায় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে।

কোচম্যান বুড়োর নাম আমার মনে পড়ে না। ওর ছেলেদের নাম আজিজ আর গণি।

কোচম্যান বুড়োর মাথায় বাবরী চুল। ওকে ঋষির মতো দেখায়। মেজাজটিও ভালো। নিষ্ঠাবান মুসলমান। সুরাপান করে না। চরিত্রদোষ নেই।

যতদিন বিবি বেঁচেছিল ততদিন অন্য বিবাহ করেনি। যখন আশি বছরের উপর

বয়স তখন শুনতে পাই বুড়ো আবার বিয়ে করেছে। কী করবে? অথর্ব হলে কে দেখাশুনা করবে?

জুড়িগাড়ী চালাবার কাজ না পেয়ে আজিজ কোথায় চলে গেছে। কিন্তু আজিজ যতদিন ছিল তার বিবিও আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত, মার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়ীর উঠোনেও আসত।

বড় মেয়ে নজবুনকেও আমার মনে পড়ে। সে তখন বিবাহিতা। ছোট মেয়ে খায়রুন্ন তো আমার চেয়ে ছোট। ওরও বিয়ে হয়ে যায়। ওকে আর দেখতে পাইনে।

দুই বোনের মাঝখানে এক ভাই। তার নাম আবদুল। সে আমার সমবয়সী ও খেলার সাথী।

কোচম্যান বুড়োর ছোট ছেলে গণি নেহাৎ ভালোমানুষ। ওকে কখনো গাড়ী চালাতে দেখিনি। ও একবার খেলনা কিনে মেলায় বেচতে বসেছিল, আমি বেশ কয়েকটা কিনি, পরে একটা কি দুটো রেখে বাকীগুলো ফেরৎ দিই। মা একসঙ্গে এতগুলো কেনা পছন্দ করেননি।

বেচারা গণি! ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়। আরো দুঃখের কারণ ওর বৌটির নাক খাঁদা। দেখতে একেবারেই সুশ্রী নয়। কিন্তু লোক ভালো।

বেড়ার এপারে আমাদের বাগান। ওপারে ওদের আঙিনা। প্রায়ই দেখা হতো। হিন্দু মুসলমান ভেদ মনে জাগত না।

তবে ছোঁয়াছুঁইর ব্যাপারটা ছিল। শেষের দিকে সেটাও ছিল না। বাবার শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণরা আমাদের বাড়ীতে আসেন না, কারণ আমার স্ত্রী খ্রীষ্টান ও বাবা তাঁকে বৌমা বলে গ্রহণ করেছেন।

তখন মুসলমানদেরই ভিতরের বারান্দায় বসিয়ে আমরা একসঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজন করি। আমাদের অগ্রণী হন কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন। পিতৃবন্ধু। উদার বৈষ্ণব। হিন্দু মুসলমানের সহভোজনে তাঁর উৎসাহ ছিল।

আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে রোজ পসরা হাঁকিয়ে যেত একটি বুড়ো মুসলমান। ওর নাম আমরা জানতুম না। পিঠে বাঁধা ওর ডালা দেখে লোকে বলত 'ডালাবালা' অর্থাৎ ফেরিওয়ালা।

ওর ডালায় থাকত কিসমিস খেজুর চীনাবাদাম। সেইরকম আরো কয়েকটি ভোজ্য। ওকে দেখলেই আমরা ওর ডালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তুম। কিন্তু দাম শুনে হাত গুটিয়ে নিতুম। এক পয়সা দু'পয়সার জন্যেও দরাদরি করতে হতো। লোকটি বিব্রত হতো।

ওর নিজস্ব কোনো আস্তানা ছিল না। থাকত এক মুসলমান দোকানীর দোকানের বারান্দায়। দোকানীকে আমি দেখিনি, ওর বিধবাকে বলা হতো 'বাড়ীবালী' অর্থাৎ বাড়ীওয়ালী। ওকে আর ওর ছেলেকে আমার বেশ মনে আছে। ওর ছেলের নাম

আলী। হাসিখুশি তরুণবয়সী।

ওদের দোকানের কোনোদিকেই মুসলমান বসতি নেই। ওই দোকানই ওদের বাড়ী।

তেমনি কোচম্যানের বাড়ীর চারদিকে হিন্দুর বাস। তা বলে এই একঘর মুসলমানকে কেউ পর ভাবে না। ধর্ম এক নয়, ভাষা এক নয়, প্রদেশও এক নয়, কিন্তু কোচম্যান পরিবারকে নিয়ে কখনো কোনো অশান্তি হয়নি। ওদেরও কোনো অশান্তির কারণ ঘটেনি।

শেষ বয়সে বুড়ো ঘরে দরজা দিয়ে কোরাণ পাঠ করত। সেবা করত তার দ্বিতীয় পক্ষ। বিবির মুখে রা ছিল না। নীরব কর্মী। আমিও বড়ো হয়ে স্থানান্তরে যাই। ওরাও আর বাইরে বেরোয় না। শুনি নব্বই বছর বয়সে নাকি বুড়োর নতুন দু'পাটি দাঁত গজিয়েছে।

আরো একঘর মুসলমান ছিলেন আমাদেরই রাস্তার ধারে কাছাকাছি। আমাদের হাই স্কুলের শিক্ষক খোন্দকার সাহেব ও তাঁর বিবি।

খোন্দকার সাহেব খুলনা জেলার লোক। হেডমাস্টার মশায়ও তাই। সেই সূত্রে এখানে চাকরি। খোন্দকার আমার কাকাদের বন্ধু। প্রায় রোজই আমাদের বাড়ী আসতেন।

আমরা তো জানতুম তিনিও আমাদের এক কাকা। সকলে বলত 'পাঠান মাস্টার'। মুসলমান মাত্রেই পাঠান। মুসলমান কথাটাই কারো মুখে শোনা যেত না। তার বদলে পাঠান।

পাঠান মাস্টারের সঙ্গে তোলা ফোটোই বোধ হয় আমার আদি ফোটো। হিন্দুর মতোই তাঁর জামাকাপড়। তিনি বাঙালী, তাঁর বিবি অবাঙালী।

খোন্দকার সাহেব হাওয়া বদলের জন্যে এসেছিলেন। স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে দেশে ফিরে যান। পরে নাকি মোক্তারি করেন। খুলনায় গেলে হয়তো তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হতো।

কিন্তু আমার বছর ছয়েকের ফোটোয় তাঁর যে ছবি ফুটেছে সেটি একটি বছর সাতাশ আটাশ বয়সের গম্ভীরপ্রকৃতির যুবকের। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত ও ভালোবাসত।

আমরা ওঁর ওখানে গেলে ওঁর বিবি আমাদের মুরগীর ডিম সিদ্ধ করে খাওয়াতেন। সেটা আমাদের বাড়ীতে নিষিদ্ধ। এখন তো ঘরে ঘরে মুরগীর ডিম, ঘরে ঘরে মুরগীর মাংস! কিন্তু সত্তর বছর আগে একথা ভাবা যেত না। তাই মাস্টারনীর কাছে যাওয়া।

কিছুদিন পরে আমার ঠাকুরদা গত হন। বাবা মা বৈষ্ণব দীক্ষা নেন। আমরা সকলেই নিরামিষাশী হতে শুরু করি।

মাংস মাত্রেই নিষিদ্ধ, মাছমাত্রেই বারণ। ডিমের তো কথাই নেই। খেতে হলে

রাঁধতে হত বাগানের এক কোণে, যেটা কোচম্যানদের আঙিনার সংলগ্ন। ততদিনে খোন্দকার বিদায় নিয়েছেন।

একটু দূরে ছিল আতাহার মিঞার বাংলা। তিনি সেই রাজ্যের একজন অফিসার। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি।

ভুঁড়ি দুলিয়ে তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী শুভাগমন করতেন। তাঁকে নিয়ে আমাদের কী ব্যস্ততা! বাবা বলতেন 'মৌলবী সাহেব'।

পোশাক আচকান পায়জামা। উর্দুভাষী, কিন্তু আমাদের সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলতেন। আমাদের খেতে দিতেন এমন চমৎকার হালুয়া যে তার স্বাদ আর গন্ধ লেগে থাকত জিবে আর নাকে।

'আতাহার মিঞা' আমাদের মুখে 'আতর মিঞা'। আমার তিন বছরের বোনকে ভুঁড়ির উপর নাচিয়ে বলতেন, "তোকে আমি সাদী করব!" আমরা তা শুনে ভয়ে অস্থির। তিনি হো হো করে হাসতেন। এমনিতেই তিনি সুরসিক প্রৌঢ়।

পরে কোথায় বদলী হয়ে যান। হয়তো অন্য কোনো রাজ্যে আরো বড়ো পদ পান।

একজন ধার্মিক মুসলমান মাঝে মাঝে এসে সত্যপীরের সিন্নি দিয়ে যেতেন। বোখারী সাহেব নামে তাঁর পরিচয়। বোধহয় বোখারা তাঁর পূর্বপুরুষের আদি নিবাস।

সিন্নি আমরা ভক্তিভরে সেবন করতুম। ছোঁয়াছুঁইর প্রশ্ন উঠত না। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এইভাবে একটা সেতুবন্ধন হয়েছিল। সেটা উভয়েরই ইচ্ছায়।

খাদ্য কার হাতে তৈরি হয়েছে এটা নিয়ে যারা প্রতিদিন জাতের বিচার করে তারা দুটি ক্ষেত্রে তা করে না। একটি জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, আরেকটি সত্যপীরের সিন্নি।

বোখারী সাহেবকে আমার স্পষ্ট মনে আছে। পরনে একপ্রকার পিরান।

সত্যপীরের মহিমাসূচক পালাকে বলত বাদী পালা। কবির গানের মতো দুইপক্ষ বাদী ও বিবাদী।

আমি যে পালাটির দর্শক ও শ্রোতা ছিলুম সেটির একপক্ষে মণিনাথ, অপর পক্ষে বংশী মিশ্র। মণিনাথ বোধহয় নাথযোগী। আর বংশী মিশ্র তো ব্রাহ্মণ। মণিনাথের পরনে লাল আলখাল্লা, হাতে চামর। মাথায় পাগড়ি কি টুপি ঠিক মনে পড়ছে না। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। বংশী মিশ্রকে দেখে মনে হয় না যে তিনি মণিনাথের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদে জিতবেন। পালার প্রথা অনুসারে তাঁরও একই রকম পরিচ্ছদ।

পালার ভাষা ভারতচন্দ্র যাকে বলতেন 'যাবনী মিশাল'। বাংলা, কিন্তু ফারসী বা উর্দুমিশ্রিত।

'শুন শুন লো মালিয়ানী বাত কহি তোরে।' পালাটা যতদূর মনে পড়ে বিদ্যাসুন্দরের।

কিন্তু তাতে কালিকার নয়, সত্যপীরের মহিমা খ্যাপন। গায়করা ওড়িয়া, শ্রোতারা ও দর্শকরা ওড়িয়া, অথচ ভাষা ওড়িয়া নয়, এ এক রহস্য।

শুনেছি ওড়িয়াতেও যাবনীমিশাল নাটক আছে, কখনো দেখিনি। সেটাও হিন্দু মুসলমানের মিলনের সেতুবন্ধ।

মহরমের সময় তাজিয়া নিয়ে আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যারা যেত তাদের দলে হিন্দুর সংখ্যা কম নয়। বাদ্যকর তো সকলেই হিন্দু।

লাঠি যারা খেলত তাদের অনেকেই হিন্দু। তারা আমাদের বাড়ীর আঙিনায় এসে লাঠিখেলা ও ছোরাখেলা দেখাত।

আর দেখাত বাঘের নাচ। বাঘ সাজত আমাদের নাপিত নন্দন, শিরিয়া বারিক। ওর সারা গায়ে হলদে কালো ডোরা। মুখেও কী যেন মাখা। চোখে কালো চশমা। করাল মূর্তি।

আমিও মনে মনে ওর সঙ্গে নাচতুম। নাচের স্টেপগুলো এখনো আমার মনে আছে। তবে আমার ঠাকুরমার মানত ছিল যে আমি বড়ো হয়ে মহরমে লাঠি খেলব। ওই জিনিসটিকে আমি ডরাই। এ জীবনে মহরমে মানত রক্ষা হয়নি। আফসোস!

মাস্টারমশাই

ঢেঙ্কানাল নামক দেশীয় রাজ্যের হাই ইংলিশ স্কুল তখনকার দিনে ওড়িশার একটি বিখ্যাত স্কুল। রাজা সাহেব ছিলেন গুণগ্রাহী ব্যক্তি। শিক্ষকরা সাধারণত সুনির্বাচিত ছিলেন। আমাদের হেড মাস্টার ছিলেন রাজেন্দ্রলাল দত্ত। বাড়ি খুলনা জেলায়। আমার জীবনে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি আমাকে স্কুলে পত্রিকা বিভাগের ভার দেন। আর সেই সব পত্রিকা পড়তে পড়তে সাহিত্যের রুচি লাভ করি।

কিন্তু আজ আমি যাঁর কথা বলবো তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার মনমোহন ঘোষ। তাঁর বাড়ি পাবনা জেলায়।

মনমোহনবাবু আমাদের ইংরেজি ও ইতিহাস পড়াতেন। ইতিহাসও পড়ানো হতো ইংরেজির মাধ্যমে। এই দুটি বিষয়েই আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠি। স্কুলের বাইরেও তাঁর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হতো।

একবার আমি ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করি। তখন তিনি বলেন : ওদের সম্বন্ধে তুমি কি জানো ? না জেনে কেন বলতে যাও ? স্কুলের লাইব্রেরীতেই আছে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখা বই, সেই বই পড়ো না কেন ?—

তাঁরই অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে বই পড়ি। এবং মনে মনে একজন ব্রাহ্ম হয়ে উঠি।

আরেকদিন তিনি ক্লাসের মাঝখানে আমাকে বলেল : দেখেছ তো একজন বাঙ্গালী হয়েছেন বিহার-ওড়িশার গভর্ণর। তিনিই কি শেষ ?

এই বলে তিনি আমার দিকে মুচকি হেসে এমনভাবে তাকান, যেন আমিই লর্ড সিংহ হবো। এমনি করে আমার মনে উচ্চভিলাষের বীজ রোপণ করেন।

এইভাবেই মনমোহনবাবু আমাকে নানাদিকে উৎসাহিত করেছিলেন। সেই জন্যে আমি লাইব্রেরী থেকে ইংরেজি বই নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলুম। বিশেষ করে ইতিহাসে যে সব বই পড়েছিলুম, পরবর্তীকালে আমার কলেজে কাজে লেগেছিল।

আমি যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই, তখন সে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢেঙ্কানালের বাইরে, কটক শহরে। সেই সময় মনমোহনবাবু ঢেঙ্কানালের ছাত্রদের ভার নিয়ে কটকে যান।

একেকদিন একেক বিষয়ে খোঁজ নিতেন, 'কে কেমন পরীক্ষা দিয়েছ, কি উত্তর লিখেছ'। এটা শুধু ইংরেজি বা ইতিহাস নয়, প্রত্যেক বিষয়ে।

আমার ভারনাকুলার ছিল ওড়িয়া। ভারনাকুলার পরীক্ষার দিন যখন প্রশ্নপত্র বিলি করা হয়, তখন কটকের এক অধ্যাপক আমার মুখ দেখে আমার হাতে বাংলার প্রশ্নপত্র গছিয়ে দেন।

আমার সে সময় বলা উচিত ছিল এটা ফেরত নিয়ে আমাকে ওড়িয়া প্রশ্নপত্র দিন। আমি পরীক্ষার আগে ফর্ম পূরণ করার সময় লিখেও দিয়েছিলুম যে আমার ভারনাকুলার ওড়িয়া।

সুতরাং সেই অনুসারেই প্রশ্নপত্রের সংখ্যাও নির্দিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষার হলে বসে আমার এসব কথা খেয়াল ছিল না।

ইতিমধ্যে আমার বাংলা রচনা টলস্টয়ের গল্পের অনুবাদ প্রবাসীতে বেরিয়ে গেছে। প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে দেখি সবই আমার জানা। কেন আমি উত্তর দেব না। লিখলুম বাংলায় উত্তর। ফলাফল সম্বন্ধে ভাবিনি। পরীক্ষার পরে মনমোহনবাবু জেরা করলেন। কি লিখেছ, কেমন লিখেছ।

আমি বাংলায় লিখেছি শুনে বললেন: তোমার তো বাংলায় লেখার কথা না। সর্বনাশ করেছ। সব মার্কস কাটা যাবে।

তখন তিনি আমাকে ধরে নিয়ে যান ল্যামবার্ট সাহেবের কাছে। তিনি ছিলেন কটক কলেজের প্রিন্সিপাল ও পরীক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। মনমোহনবাবু তাঁকে বলেন: আমার এই ছাত্র ভুল করে ওড়িয়ার বদলে বাংলায় পরীক্ষা দিয়েছে। এর উত্তরপত্র যেন বাংলার পরীক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আর একে যেন ক্ষমা করা হয়।

মনমোহনবাবু খুব পড়াশোনা করতেন, ছাত্রদের জন্যও পরিশ্রম করতেন। কেউ তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি যত্ন করে বুঝিয়ে দিতেন। কখনো রাগ করতেন না। ছাত্রদের স্নেহের চোখে দেখতেন।

ওঁকে আমি রোজই দেখতুম আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে। তখন তাঁর একমাত্র ধ্যান যেন বাজারে মাছ পাওয়া যাবে কিনা। আমাদের ওটা মৎস্য প্রধান জায়গা ছিল না। কাজেই মৎস্যের সন্ধান ছিল মৎস্যগত-প্রাণ বাঙ্গালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ভদ্রলোক ছিলেন ওজনে ভারী। কিন্তু পা দুটো ছিল খুবই ছোট। তাই স্কুলের দুষ্টু ছেলেরা আড়ালে বলতো 'গুণ্ঠনি হাতি'।

তিনি খুব কম কথা বলতেন। কিন্তু ক্লাসে যখন পড়াতেন তখন খুব ভালো ইংরেজিতে বোঝাতেন। পরবর্তীকালে আমার উচ্চতর শিক্ষার কৃতিত্বের জন্যে আমি মনমোহনবাবুর কাছে ঋণী।

রাজা সাহেবের জয়যাত্রা

প্রাচীন ভারতের রীতি ছিল বিজয়া দশমী বা দশহরার দিন দিগ্বিজয় যাত্রা।

সেকালের সেই রীতি একালের দেশীয় রাজ্যের নৃপতিরাও পালন করতেন।

আমাদের রাজা সাহেবকে সাধারণ প্রজারা বলত ''শ্রী ছামু''। অর্থাৎ ''হিজ হাইনেস''। তিনি প্রাসাদ থেকে কোথাও বেরোলে প্রজারা বলত ''শ্রী ছামু বিজে করেছেন।''

অর্থাৎ তিনি বিজয় করেছেন। লোকলস্কর নিয়ে তাঁর বিজয় করাটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল রথযাত্রা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়। দশহরার দিন তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধযাত্রায় বিজে করতেন। ব্রিটিশ আমলে সৈন্যসামন্ত কোথায় যে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাত্রা করবেন ? মধুর অভাবে গুড়। সৈনিকের অভাবে পাইক। রাজ্যের অনেক জায়গায় পাইকরা জায়গীর ভোগ করত। কবে তাদের পূর্বপুরুষরা বর্গীর সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতেছিল। যে যুদ্ধক্ষেত্রে জিতেছিল সেটা আমাদের গড় থেকে বেশি দূরে নয়। ''যাঠিএ বাটিআ'' অর্থাৎ যাট একর বলে তার পরিচয় এখনো মুছে যায়নি। যদিও যুদ্ধক্ষেত্র এতদিনে ধান্যক্ষেত্রে পর্যবসিত।

রণবাদ্য বাজিয়ে পাইক যোদ্ধাদের নিয়ে শ্রী ছামু বছরে একটা দিন ''যাঠিএ বাটিআ'' অবধি বিজে করে 'বিষম সমর বিজয়ী' হয়ে সাড়ম্বরে প্রত্যাবর্তন করতেন। সকালবেলাই তার শুরু আর শেষ।

বিকেলে রাজবাড়ির সামনে শামিয়ানার নিচে বসে যেটা নিরীক্ষণ করা হতো সেটা প্রজাসাধারণের আমোদপ্রমোদ। রাজা সাহেবের পেছনের সারিতে রাজকর্মচারীদেরও আসন থাকত। আমরা ছোটরা একটু এগিয়ে গিয়ে সতরঞ্চির ওপর আসর জমাতুম।

কত রকম তামাশা দেখানো হতো। গোটাতিনেক পরিষ্কার মনে আছে সত্তর বছর পরেও। একটা হলো 'চর্বিলিপ্ত স্তম্ভ।' সে গল্প আগে বলেছি। তেমনি—

ময়দার হাঁড়িতে চোখ বেঁধে মুখ ঢুকিয়ে তলা থেকে দুয়ানি কি সিকি মুখে করে তুলে আনা গায়ের জোরে নয়, বরাতের জোরে ঘটে।

দশজনে চেষ্টা করে, একজন হয়তো পারে। মুখে ময়দা মেখে যে যা হয় তা দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠি, ''ওই রে, ভালু, গিরিয়া ভূত।'' আমার মেজভাইয়ের ডাকনাম ভালু। আর গিরিয়া আমাদের পরলোকগত নরসুন্দর।

রাজা সাহেব আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসেন। আমি পালাবার পথ খুঁজে পাইনে।

এর পরে গাধার দৌড়। গাধার দৌড়ের নিয়ম যার গাধা লাস্ট সেই সওয়ার পাবে পুরস্কার।

দুর্গোৎসব বলতে বাড়ির বাইরে এই বোঝাত। দুর্গাদেবীর মন্দির ছিল বইকি। সেখানে

নিত্যসেবা পুজো হতো। কিন্তু বাৎসরিক উৎসবও নয়, বলিদানও নয়।

আমাদের বাড়িতে আমরা একটি জলচৌকির উপর ঘট স্থাপন করে একপাশে আমাদের বংশের অতি পুরাতন তরবারি রাখতুম। আরেক পাশে আমাদের বাড়ির দেশী বিলিতি বইপত্র। বাংলা কবিকঙ্কণ চণ্ডী থেকে ইংরেজি শেক্সপীয়ার গ্রন্থাবলী। পুষ্পাঞ্জলি যথারীতি দেওয়া হয়।

সন্ধ্যাবেলা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করি আমি, শুনতে আসেন বাড়ির আর সকলে। পড়তে হতো সুর করে। প্রত্যেকটি পদের পর কোরাস গেয়ে উঠতেন ওঁরা।

আমি হয়তো পড়লুম, "ঈশানে উরিল মেঘ করে দূর দূর।" অমনি ঠাকুমা, ঠাকুরদা, মা, বাবা ইত্যাদি গেয়ে উঠতেন, "হায় রে নায় রে নায় রে!"

তেমনি আরো কয়েকটি বোল ছিল, "কেমন দুর্গার নাম!" "মায়ের মহিমা।" "তুমি না রক্ষিলে কে বা রক্ষিবে তারিণী!"

শ্রীকান্তকে যখন মশানে নিয়ে যাওয়া হয় কেউ কেউ কেঁদে ওঠেন ও কাতর প্রার্থনা করেন।

বিজয়ার দিন আমরা রাজা সাহেবের দিগ্বিজয়ের দৃশ্য দেখতে বেরিয়ে পড়তুম। বাড়িতে কেউ সিদ্ধিপান করতেন কিনা জানতুম না।

কিন্তু একবার বড়কাকিমা না কে যেন এক বাটি সিদ্ধি এনে আমাদের ক'ভাইকে বলেন চুমুক দিতে। আমরা একটুখানি মুখে ছুঁইয়েই নেশার ভান করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নেশা হয়নি। কিন্তু ভানটাকে সত্য মনে করে মা কি কাকিমা আমাদের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেন। আমরা চেঁচামেচি করলে ওঁরা ঠাওরান নেশাটা জমেছে। ক্লান্ত হয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। যখন ঘুম ভাঙে তখন এত দেরি হয়ে গেছে যে সাজপোশাক পরে রাজা সাহেবের সঙ্গে বসে তামাশা দেখা হয় না। সেবার কী জানি কী নতুন মজা দেখানো হলো!

আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে ঠাকুরদা একদিন পরলোকে চলে যান।

ঠাকুমার বরাবর আশঙ্কা ছিল যে তাঁর বড় ছেলে নিমাইচরণ একদিন নিমাইয়ের মতো সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। তিনি সন্ন্যাসী হলেন না, কিন্তু রামদাস বাবাজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে সস্ত্রীক বৈষ্ণব। বাড়িতে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়।

দুর্গাপুজো আর হয় না। তরোয়াল উধাও। কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ বন্ধ। প্রতি সন্ধ্যায় মা করেন জয়দেব থেকে গান, বাবা বিদ্যাপতি থেকে আবৃত্তি। প্রায়ই কীর্তনের আসর বসে। তার সব চেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হরির লুট। আমরাও সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলি, "রাধারাণী কী জয়!" কিন্তু রাধার বিগ্রহ তো প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। কৃষ্ণেরও না। বৈষ্ণব পদাবলী পড়ি।

কিন্তু পরিবারসুদ্ধ সবাই বৈষ্ণব হয় না। মোগল আমলের তালুকদার আমরা বংশানুক্রমে শাক্ত। দেশের বাড়িতে বাংলাদেশের মতো মাটির প্রতিমা নির্মাণ করে

শারদীয়া দুর্গাপুজো হতো ও হয়।

পাঁচবছর বয়সে ঠাকুমা আমাকে সেখানকার পুজো দেখাতে নিয়ে যান, কিন্তু মহিলারা আমাকে একটা ঘরে কয়েদ করে রাখেন। অস্পষ্ট শুনতে পাই ছাগকণ্ঠের আর্তস্বর। ছাড়া পেয়ে দেখি আঙিনা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ছাগলের মুণ্ডু। বলিদানের ওপর আমার ঘেন্না ধরে যায়।

সেটা বোধহয় এতদিনে চালকুমড়ো বলিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ঠাকুরদা স্বেচ্ছানির্বাসিত, বাবাও তাই, আমিও তাই। অন্যান্য শরিকেরা প্রথা রক্ষা করেন।

ছোটদের জন্যে লেখা

ছোটদের জন্যে লেখা আর বড়োদের জন্যে লেখা একই কলমেই লেখা। যে লেখে সে একই মানুষ। তার মানসে বা হৃদয়ে দুটো পরিচ্ছন্ন ভাগ নেই। যারা পড়ে তাদেরও কি দুই স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত করা যায়? আমি জানি বহু বয়স্ক ব্যক্তি আমার ছড়া পড়েন ও কেউ কেউ মুখস্থ বলতে পারেন। কই, আমি তো তাঁদের কথা ভেবে লিখিনি। আবার এটাও এক আশ্চর্যের ব্যাপার যে আমার সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎ করতে এসে আমাকে বলে গেছেন আলাদা আলাদা ভাবে কলকাতার এক মহিলা ও আলিগড়ের এক অধ্যাপক যে, স্কুলের পড়া শেষ না করতেই তাঁরা পড়েছিলেন আমার ছয় খণ্ডের মননপ্রধান উপন্যাস 'সত্যাসত্য'। সে বয়সে সবটা বুঝতে পারেননি, পরে আবার পড়ে বুঝেছেন।

না, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আমি নিজেই তো বারো বছর বয়সে 'সবুজপত্রে' প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'চার ইয়ারী কথা' আবিষ্কার করে বুঁদ হয়ে পড়েছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' আমাকে আকর্ষণ করেনি। তা হলে কি 'চার ইয়ারী কথা' শিশুপাঠ্য? আরো আগে পড়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর কয়েকটি উপন্যাস। বিশেষ করে 'দুর্গেশনন্দিনী'। আরো আগে পড়েছি ও পড়ে বাড়ির সবাইকে শুনিয়েছি 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'। কৃত্তিবাসের রামায়ণও আগাগোড়া পড়েছি, কিন্তু কাশীদাসের মহাভারতের সবটা নয়। ওসব কি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ? এমন কথা বলতে পারব না যে সে বয়সে অর্থ অনুধাবন করেছি বা রস আস্বাদন করেছি। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে আকর্ষণ বোধ করেছি। কোনো কোনো বই আমি চুরি করে পড়েছি। গুরুজনকে জানতে দিইনি। যেমন ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'। পাঠ্যপুস্তক ফেলে উপন্যাস পড়ছি দেখে আমার মা একবার তটস্থ হয়েছিলেন। ডিটেকটিভ উপন্যাস কি কম পড়েছি নাকি? সত্যিকার অপরাধকাহিনী 'দারোগার দপ্তর' ছিল বীভৎস রসের আধার। আদি ও বীভৎস ছাড়া বীররসের কাব্য উপাখ্যানও আমাকে আকর্ষণ করত। প্রত্যেক বছরের 'নতুন পঞ্জিকা' ছিল আমার প্রিয়পাঠ্য। বটতলার পুঁথি আর 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' আমি গোগ্রাসে গিলেছি। গড়গড়চন্দ্রের মতো ভুটও খেয়েছি, টামাকও খেয়েছি। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। সে বয়সে আমার ভালোমন্দের বাছবিচার ছিল না। মূল্যবোধটা আসে পরবর্তী বয়সে। কাকে বলে আর্ট, কার নাম ক্লাসিক, কোনটা বিশ্বজনীন তথা চিরন্তন, কোন্ গ্রন্থ আমাকে অমৃত দিয়ে সমৃদ্ধ করবে, কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করবে না, এসব গণনা একজন সাবালকের। ক্রমে ক্রমে আমি আবিষ্কার করি যে আমিও লিখতে পারি ও আমারও কিছু দেবার আছে। প্রধানত বড়োদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই লিখি। কারো কারো হৃদয় পাবার জন্যে। লেখা

দিয়েও হৃদয় জয় করা যায়, এটাও আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমার মধ্যে একজন ছেলেমানুষও ছিল। সে চাইত ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি করতে। একই সময়ে লেখা হয় 'বিচিত্রা'র জন্যে 'পথে প্রবাসে' আর 'মৌচাকে'র জন্যে 'ইউরোপের চিঠি' কিস্তিতে কিস্তিতে। কিছুদিন পরে ছেলেমানুষীর জন্যে অবসর পাইনে, সরকারী কাজে জড়িয়ে পড়ি। যদি-বা একটু সময় মেলে সেটুকু আমার ছয় খণ্ডের উপন্যাসের জন্যে বাঁধা। আমি যে ভিতরে ভিতরে একটি শিশু আমাকে দেখে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না, আমি নিজেই বিশ্বাস করিনে। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি প্রবীণদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁদের সমকক্ষ হতে। সেটাই যেন মোক্ষ।

কী ভাগ্যি এক মহাশিশুর সঙ্গে রেলপথে নিভৃত ভ্রমণ। মহাশিশু একজন মহাশিল্পীও বটে। তিনি বলেন, "আমি আজকাল ছড়া লিখছি। তুমিও লেখ না কেন?" আমি সবিনয়ে নিবেদন করি, "ছড়া আমার হাত দিয়ে হবে না।" তিনি কলকাতা ফিরে গিয়ে কী মনে করে আমাকে তাঁর 'সে' বইখানি পাঠিয়ে দেন। সেই একটি উপহারই আমি কবিগুরুর কাছ থেকে পেয়েছি। তাতে তাঁর নিজের অনেকগুলি ছড়া ছিল। তিনি কি চেয়েছিলেন যে আমিও সেরকম কিছু লিখি? তেমন ক্ষমতা বা অভিলাষ আমার ছিল না। যুদ্ধের মাঝখানে বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে কবিতা লিখতে গিয়ে হঠাৎ আমার ছড়ার হাত খুলে যায়। কিন্তু সেসব ছড়া ছোটদের জন্যে লেখা নয়। তাদের জন্যে লেখার খেয়াল যখন জাগে তখন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্কলিত 'খুকুমণির ছড়া' আমার আদর্শ হয়। রবীন্দ্রনাথের ছড়া নয়। সুকুমার রায়ের ছড়াও নয়। যদিও আমি এদের ছড়ার ভক্ত।

চালাকচতুর সেয়ানা লেখকের পাকা হাতের ছড়া এক জিনিস আর ঠাকুমা দিদিমা মাসীপিসীর বা চাষাভূষার অশিক্ষিত মুখের ছড়া আরেক জিনিস। আমাদের সাবেক কালের ছড়া ছিল মৌখিক ঐতিহ্যের। মুখে মুখে কাটা হতো। কাগজ কলম নিয়ে মাথা খাটিয়ে বানানো নয়। আমি মৌখিক ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করতে চাই। তাই অচেনা অজানা ছড়াকারদেরই গুরুবরণ করি। ছল চাতুরি সযত্নে পরিহার করি। কলেজে পড়াশুনা করে, বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, সরকারী চাকরি করতে করতে আমার মনে পাক ধরেছিল। আমার উপন্যাস বা প্রবন্ধ পড়তে গেলেই সেটা টের পাওয়া যেত। সেই আমি সব রকম কৃত্রিমতা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যখন ছড়া লিখতে বসি তখন আমি অন্য ধাতের মানুষ। আমার অন্য এক স্বরূপ। সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে দুই চরিত্রের ভূমিকা। ছড়ার জন্যে আমি অসংখ্য ফরমাস পাই, কিন্তু আমার নিয়ম হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত না হলে ছড়া না লেখা। ম্যানুফ্যাকচার না করা। এটা একটা ইণ্ডাস্ট্রি নয়। এটা একটা আর্ট। গল্প উপন্যাস বানিয়ে বানিয়ে লেখা যায়, ছড়া বানাতে গেলে তা ছড়ার মতো শোনায় না। পদ্যের মতো শোনায়। আমারও তো ভয় হয় যে কখনো কখনো আমি ছড়া লিখতে গিয়ে পদ্য লিখেছি। পথভ্রষ্ট হয়েছি। না, আমার ছড়া

সব সময় ছড়া হয়নি। বোধহয় অত বেশি না লিখলেই হত। কিন্তু কী করি, কেউ চাইলে 'না' বলতে পারিনে। অনেকদিন থেকে আমি চেষ্টা করছি ব্যালাড লিখতে। ইংরেজিতে কত সুন্দর সুন্দর ব্যালাড আছে। বাংলায় নেই। যাকে ব্যালড বলে চালানো হচ্ছে তা অন্য জিনিস। ব্যালাড রচনায় আমার প্রগতি বেশি দূর নয়। কী করি, পণ করলেই তো পণরক্ষা হয় না। আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ ব্যালাড আমি একদিন লিখবই। যদি ছেলেমানুষ হতে ভুলে না যাই।